সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	ভূমিকা	২
২.	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন এবং কার্যক্রম	৩
৩.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং প্রধান কার্যক্রমসমুহ	৩
৪.	প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কৌশল	৩
৫.	মানব সম্পদ উন্নয়ন	৬
৬.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৭
৭.	নেতৃত্ব, জেন্ডার ও নারীর ক্ষমতায়ন	৮
৮.	দল গঠন ও সংগঠন ব্যবস্থাপনা	৯
৯.	জীবনিরাপত্তা	১১
১০.	১০ মুরগি পালন	১৩
১১.	১০.১ মুরগির উন্নত জাত নির্বাচন	১৩
১২.	১০.২ মুরগির বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা	১৪
১৩.	১০.৩ বাড়ন্ত মুরগির ব্যবস্থাপনা	১৬
১৪.	১০.৪ ডিমপাড়া মুরগির ব্যবস্থাপনা	১৭
১৫.	১০.৫ ডিম পাড়া মুরগির বাসস্থান, ডিমপাড়ার বাসা স্থাপন, আলোক বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনা,	১৮
১৬.	১০.৬ মুরগির গুরুত্বপূর্ণ রোগ, লক্ষণ ও করণীয়	১৯
১৭.	১০.৭ সোনালী মুরগি পালনে আয়-ব্যয়ের হিসাব	২৫
১৮.	১১. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা গবাদি পশু ও পোল্ট্রি খামারে বর্জ্য ব্যবহার করে কম্পোস্ট বা জৈব সার তৈরি	২৬
১৯.	১২. দুর্যোগকালে গবাদিপশুর জন্য করণীয়	২৮

ভূমিকাঃ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লক্ষ্য ছিল দেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করা । বর্তমান সরকার সর্বদাই দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হয়েছে। এই সোনার বাংলা হবে দারিদ্র্যমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত যেখানে দ্রুত জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধি ঘটবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কার্যকরী পরিকল্পনার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশিত উন্নয়ন পথ ও দর্শন অনুসরণ করে সেই মোতাবেক

রূপকল্প ২০২১ এবং এ সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ ঘোষণার মাধ্যমে দারিদ্র্য মোকাবেলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এর লক্ষ্য ছিল ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা লাভ, মানব উন্নয়ন এবং দ্রুত দারিদ্র্য নিরসন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সুদক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ফলে বাংলাদেশ নির্বিঘ্ন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করে। ফলে ২০১৮ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সকল মানদণ্ড পূরণ করে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকাভুক্ত হয়। বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক সংজ্ঞায়িত নিম্ন আয়ের দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে এসে ২০২১ সালের লক্ষ্যমাত্রা সময়ের আগেই নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় স্থান পায়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। প্রাণিসম্পদ খাতে সার্বিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ সাধনের জন্য সরকার সুনির্দিষ্ঠ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছে। সরকারের উন্নয়ন দর্শন এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত অষ্টম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনায় (২০২১-২০২৫) প্রাণিসম্পদ সেক্টরের অর্জিতব্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৪৪% এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩.৮০%। মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৩.১০%। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষ ভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের উপর নির্ভরশীল। প্রাণিসম্পদ কৃষকের কর্মসংস্থান, নগদ আয়, পুষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদার উৎস। বর্তমানে দুধ, মাংস ও ডিমের প্রাপ্যতা বেড়ে যথাক্রমে ১৯৩.৩৮ মিলি/দিন, ১৩৬.১৮ গ্রাম/দিন এবং ১২১.১৮টি/বছর এ উন্নীত হয়েছে। জনসংখ্যা ও আয় বৃদ্ধির সাথে দুধ, মাংস, ডিমের সাথে এ সব পণ্য থেকে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের অভ্যন্তরীণ চাহিদাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । এতদসত্ত্বেও সরকারের নীতি ও কৌশলের পাশাপাশি ব্যক্তি খাতের উদ্যোগের কারণে চাহিদা ও উৎপাদনের ব্যবধান ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে । গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগি উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হল সুষম খাদ্যের নিশ্চয়তা। দেশে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির খাদ্য ঘাটতি মেটানোর জন্য খামারীদের উন্নতজাতের ঘাস, অপ্রচলিত ফডারশস্য ও ভূট্টা চাষে উদ্বুদ্ধ করা এবং ঘাসের কাটিং বা বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে। সর্বোপরি, পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি নিয়োগ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভ্যালু চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সহায়তার বৃদ্ধি, পিপিপি এবং আর্ন্তজাতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ২০২৩ সালের মধ্যে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের সকল মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহন ও জীবনমান উন্নয়ন ব্যতীত টেকসই উন্নয়ন কোনক্রমেই সম্ভব নয়। হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের দারিদ্রপীড়িত ৭টি জেলার ৫৩টি উপজেলার বেকার ও দরিদ্র যুবসম্প্রদায় বিশেষত নারী জনগোষ্ঠীকে প্রাণিসম্পদের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ তথা আত্মকর্মসংস্থান ও নারীর ক্ষমতায়নে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। হাওর অঞ্চলের সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সুফলভোগীদের মাঝে হাঁস, মুরগি, ছাগল ও ভেড়া বিতরণ করা হবে যা গ্রামীণ পরিবেশে পালনের জন্য খুবই উপযোগী।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন

রূপকল্প (Vision)

সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ সরবরাহকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim and Objectives):

- গবাদিপশু পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- গবাদিপশু পাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্যের (দুধ, মাংস ও ডিম) উৎপাদন ও রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা;
- গবাদিপশু পাখির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

প্রধান কার্যাবলী (Main Functions):

- প্রাণিজ আমিষ তথা দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
- গবাদিপশু পাখির চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে গবাদিপশু পাখির জাত উন্নয়ন এবং কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ;
- গবাদিপশু পাখির পুষ্টি ও পশুখাদ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ সেক্টরে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ;
- প্রাণিজাত খাদ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও মূল্য সংযোজনে উদ্যোক্তা তৈরী;
- GAP/GLP প্রচলনের মাধ্যমে খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন;
- দেশীয় প্রজাতির কৌলিক মান সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণার চাহিদা নিরুপণ ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ;
- দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা ও সেক্টরাল কর্ম-কৌশলের আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- প্রাণিসম্পদ সেক্টরে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি, নীতিমালা ও নির্দেশিকা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং বাস্তবায়ন।

পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ খ্রিঃ অনুযায়ী বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামার স্থাপনের শর্তাবলী ঃ

- বাণিজ্যিক খামার ঘনবসতি এলাকা এবং শহরের বাইরে স্থাপন করতে হবে।
- একটি বাণিজ্যিক খামার হতে অন্য একটি বাণিজ্যিক খামারের দুরত্ব ন্যূনতম ২০০ মিটার হতে হবে।
- ব্রিডিং খামারের পারস্পারিক দূরত্ব ন্যূনতম ৫ কিলোমিটার হতে হবে।
- গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক এবং প্যারেন্ট স্টক খামার লোকালয়ের বাইরে স্থাপন করতে হবে এবং উভয় শ্রেণির খামারের ২ কিলোমিটারের মধ্যে কোন প্যারেন্ট স্টক/ বাণিজ্যিক খামার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।
- গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক ও প্যারেন্ট স্টক খামার স্থাপনের পূর্বে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।
- খামার ও হ্যাচারী স্থাপন পরিকল্পনায় উন্নত জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থার উল্লেখ থাকতে হবে।
- খামার ও হ্যাচারী পরিবল্পনায় বর্জ্য স্বাস্থসম্মত উপায়ে অপসারনের ব্যবস্থা থাকতে হবে; এবং
- খামার ও হ্যাচারীর জন্য নির্ধারিত স্থানে স্বাস্থসম্মত বর্জ্য অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানের সংস্থান থাকতে হবে।

হাওর প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১) সমন্বিত পদ্ধতিতে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হাওরাঞ্চলীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠির মাথাপিছু প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ বৃদ্ধিকরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন।

২) প্রাণিসম্পদ খাতে উন্নত ও টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।

৩) নারীর আত্ন-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, তাদের জীবনমান উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন।

প্রকল্পের ফলাফল

- নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে।
- খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার উন্নয়ন এবং মাথাপিছু প্রাণিজ আমিষ গ্রহনের পরিমান বৃদ্ধি পাবে।
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- নারীর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পাবে এবং ক্ষমতায়ন ঘটবে।
- প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে ঘাস চাষ এবং এর বাজার সৃস্টির মাধ্যমে গবাদিপশুর খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন হবে।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠী ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে অনুপ্রাণিত হবে।

- অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে সচেতনতা ও নৈপুণ্য বৃদ্ধি পাবে।
- দরিদ্র পরিবারগুলোর জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি এবং বৈরী অবস্থায় টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে।

প্রকল্পের আউটপুট

- ৫৩টি উপজেলায় ২৫৫২টি সুফলভোগী দল গঠিত হবে
- ৫১২৭৬ জন সুফলভোগী খামারী ও ৩৩৮ জন লাইভস্টক ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর প্রশিক্ষিত হবে।
- ৫১২৭৬ জন প্রশিক্ষিত সুফলভোগী পরিবার বিভিন্ন প্যাকেজে উপকারণ ও প্রযুক্তি ও প্রাণিসম্পদ সেবা গ্রহণ করবে
- ৫৩টি উপজেলায় মোট ৩৮০টি সাইলেজ প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হবে।
- ৩৩৮টি ইউনিয়নের মোট ৬৭৬ জন (৫০% মহিলা) প্রশিক্ষিত ভ্যাক্সিনেটর তৈরী হবে।
- অষ্টোগ্রাম উপজেলার ৫০জন পনির উৎপাদনকারী সুফলভোগী সরহায়তা প্রাপ্ত হবে।
- হাওরাঞ্চলীয় দরিদ্র পরিবারের জীবন মানের উন্নয়ন করা হবে।

৮টি প্যাকেজ:

ক্রমিক নং	প্যাকেজের নাম	সুফলভোগী সংখ্যা
০১	হাঁস পালন	১৭৪৮০ জন
০২	ছাগল পালন	৫৮৫০ জন
০৩	মুরগি পালন	১৭৪৮০ জন
০৪	ভেঁড়া পালন	৫৮৬৫ জন
০৫	ঘাস চাষ	৩৩৮০ জন
০৬	ভ্যাকসিনেটর	৬৭৬ জন
০৭	পনির উৎপাদনকারী	৫০ জন
০৮	সাইলেজ প্রদর্শনী প্লট	৩৮০টি

প্রকল্পভুক্ত জেলা ও উপজেলার নামঃ

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা
১.	সুনামগঞ্জ	১. সদর, ২. জগন্নাথপুর, ৩. ধর্মপাশা, ৪. জামালগঞ্জ, ৫. ছাতক, ৬. শাল্লা ৭. তাহিরপুর, ৮. বিশ্বম্বপুর, ৯. দিরাই, ১০. দোয়ারাবাজার এবং ১১. দক্ষিণ সুনামগঞ্জ
২.	সিলেট	১. জৈন্তাপুর, ২. বিয়ানীবাজার, ৩. ফেঞ্চুগঞ্জ, ৪. বালাগঞ্জ, ৫. বিশ্বনাথ, ৬. দক্ষিণ সুরমা, ৭. গোয়াইনঘাট, ৮. জকিগঞ্জ, ৯. কানাইঘাট এবং ১০. গোলাপগঞ্জ
৩.	হবিগঞ্জ	১. আজমেরীগঞ্জ, ২. সদর, ৩. বাহুবল, ৪. লাখাই ৫. বানিয়াচং, ৬. নবীগঞ্জ এবং ৭. মাধবপুর
৪.	মৌলভীবাজার	১. কুলাউড়া, ২. রাজনগর, ৩. শ্রীমঙ্গল, ৪. বড়লেখা এবং ৫. জুড়ি
৫.	নেত্রকোণা	১. আটপাড়া, ২. কমলাকান্দা, ৩. খালিয়াজুরী, ৪. মোহনগঞ্জ, ৫. মদন, ৬. কেন্দুয়া, ৭. নেত্রকোণা সদর ৮. দূর্গাপুর এবং ৯. বারহাট্টা
৬.	কিশোরগঞ্জ	১. মিঠামইন, ২. করিমগঞ্জ, ৩. অষ্টগ্রাম, ৪. ইটনা, ৫. নিকলী, ৬. বাজিতপুর ৭. কুলিয়ারচর, ৮. তাড়াইল, ৯. ভৈরব এবং ১০. কটিয়াদি
৭.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১. নাসিরনগর

মোট উপজেলার সংখ্যা ৫৩টি

প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কৌশল

প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম:

প্রযুক্তি সনাক্তকরণ, বাস্তবায়ন এবং প্রদর্শনীর জন্য নিম্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে

১. খামারী সুফলভোগী গ্রুপ হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাবিত কাঠামোর মধ্যে প্রযুক্তি সনাক্ত করবে। প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট উৎপাদনে খামারীর দক্ষতার উপর ভিত্তি করে প্রদর্শনী পরিচালনার জন্য খামারীকে নির্বাচন করা হবে।
২. যদি একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তি একাধিক স্থানে প্রদর্শিত হয়, সে ক্ষেত্রে হিসাব করা হবে এক প্রযুক্তি দ্বারা দুইটি প্রদর্শনী করা হয়েছে।
৩. সকল প্রকার প্রযুক্তি প্রদর্শনীদের খামারে/প্লটে প্রদর্শিত হবে।
৪. প্রযুক্তি প্রদর্শনী আয়োজনে প্রকল্প থেকে সকল প্রকার উপকরণ সরবরাহ করা হবে এবং খামারী উক্ত প্রদর্শণীতে প্রয়োজনীয় শ্রম ও জমি/খামারী প্রদান করবেন।
৫. প্রদর্শণীর জন্য নির্ধারিত খামারী প্রদর্শনকৃত প্রযুক্তি গ্রহণে প্রতিবেশী খামারীদেরকে উৎসাহিত করবেন।
৬. প্রদর্শনীর জন্য নির্ধারিত খামারী উক্ত প্রদশর্ণীর মাঠ দিবস পরিচালনায় লাইভস্টক ফিল্ড ফেসিলিটেটরকে সর্বাত্নক সহযোগিতা করবেন।
৭. প্রতিটি প্রদর্শনীর জন্য একটি করে মাঠ দিবস থাকতে হবে। দলীয় সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় প্রদর্শনীর ফলাফল অর্থাৎ উৎপাদনের দিন এই মাঠ দিবসের অয়োজন করা হবে।

৮. প্রতিটি প্রযুক্তি প্রদর্শনীতে তথ্যবহুল দৃশ্যমান সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে।

প্রযুক্তি প্রদর্শনীর জন্য খামারী নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়ঃ

১. প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত/মনোনয়নকৃত খামারী অবশ্যই স্থায়ী বাসিন্দা এবং স্থানীয়ভাবে সকলের নিকট সুপরিচিত হবেন।
২. তিনি বাংলা পড়তে ও লিখতে পারবেন।
৩. প্রদর্শনীর জন্য তাঁর প্রাণী/চাষযোগ্য জমি থাকবে এবং তিনি উক্ত প্রাণী/জমি প্রদর্শনীর কাজে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক থাকবেন।
৪. প্রদর্শণী সংশ্লিষ্ঠ বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ এবং নেতৃত্বের গুণাবলী ও উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষমতাবান হবেন।
৫. সদস্যের প্রাণিসম্পদ বিষয়ক মূখ্য পেশা হতে হবে।
৬. তিনি নতুন/উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ এবং বাণিজ্যিক খামার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হবেন।
৭. নতুন/উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে খামারীদের তিনি সহায়তা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন।
৮. প্রদর্শণীর শর্তাবলী পালনে তিনি সম্পূর্ণরূপে সম্মত হবেন।

প্রযুক্তি প্রদর্শনী প্লট/খামার নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়

১. প্রদর্শনী প্লট/খামার অবশ্যই দৃশ্যমান স্থানে হওয়া উচিৎ যাতে খামারীগণ উক্ত প্রদর্শনী প্লট/খামার সহজেই প্রবেশ করে প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারেন। এ জন্য রাস্তার পার্শ্বের প্রদর্শনী প্লট/খামার অগ্রাধিকারযোগ্য।
২. প্রদর্শনী প্লট/খামার উচু জমিতে করতে হবে যাতে বন্যায় ক্ষতি না হয় এবং সারা বছর ব্যবহারযোগ্য হয়।
৩. প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত খামারী BG সদস্যের অন্তর্ভূক্ত হতে হবে, যারা মূলত সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে চাহিদা বা সমস্যা চিহ্নিত করেছেন এবং প্রদর্শনী থেকে উক্ত সমস্যা সমাধানে আগ্রহী।
৪. যদি একক খামারী প্রদর্শনী হয় তাহলে খামারী গ্রুপের সকল সদস্যের সম্মতিতে খামার নির্বাচিত করতে হবে।

খামার ঃ (ছাগল/ভেড়া পালন, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি)

- খামারটি সুবিধাজনক ও পরিমানমত জায়গায় হতে হবে। খামারটি পরিদর্শনের জন্য যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে।
- খামারে বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ এবং বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- মুরগী খামারের ক্ষেত্রে বাহির হতে যাতে কোন প্রাণী খামারে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- হাঁস পালনের ক্ষেত্রে খামারের নিকট পুকুর বা জলাশয় থাকতে হবে।

ঘাস চাষ প্রদর্শনী

ঘাস চাষ প্রদর্শনী মূলত কৃষকের নির্ধারিত প্লটে করা হয়।

- ঘাস চাষের জমিটি কাঙ্খিত আকার ও আকৃতির এবং খোলামেলা স্থানে হতে হবে।
- ঘাস চাষের জমির মাটির ধরণ ঘাস চাষের উপযোগী থাকতে হবে।
- ঘাস চাষের জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- প্রদর্শনীর ঘাস কাটিং পর্যায়ে এলে খামারীদের নিয়ে মাঠ দিবস করতে হবে।

প্রযুক্তি প্রদর্শনীঃ

প্রযুক্তি প্রদর্শনী সম্প্রসারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তি বা কৌশল ব্যবহারের ফলে কৃষকের খামারে উৎপাদনের উপর যে প্রভাব পড়ে তা প্রদর্শন করাই প্রযুক্তি প্রদর্শনীর মূল লক্ষ্য। নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তরের পূর্বে উক্ত প্রযুক্তি স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি না এবং প্রযুক্তিটি কৃষকের চাহিদার ভিত্তিতে করা হয়েছে কি না এ সব যাচাই বাছাই করে প্রযুক্তি নির্ধারণ করতে হবে। খামারীদের নিকট প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি হস্তান্তরে প্রদর্শনীর সুবিধা হচ্ছেঃ

১. খামারীদের লেখাপড়া কম জানা থাকলেও, প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাদের বুঝাতে অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়।
২. খামারী প্রযুক্তি দেখে ও নিজ হাতে করে সহজেই তা শিখতে পারেন এবং অতি সহজেই নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হন।
৩. এর ফলে খামারী ও সম্প্রসারণ কর্মীর মধ্যে বিশ্বাস এর স্তর বেড়ে যায় এবং সম্পর্ক সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।
৪. অন্যদিকে খামারী সমাবেশ ও মাঠ দিবস কার্যক্রমে প্রদর্শনী সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

প্রযুক্তি প্রদর্শনী সাধারণত দুই প্রকারের, যথা- (ক) ফলাফল প্রদর্শনী ও (খ) পদ্ধতি প্রদর্শনী

(ক) ফলাফল প্রদর্শনীঃ

যখন কোন উপকরণ ব্যবহার বা কোন কৌশল প্রয়োগের ফলে উৎপাদনের উপর এর প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা হয় তাকে ফলাফল প্রদর্শনী বলা হয়। যেমন- একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একটি গরুকে সাইলেজ খাওয়ানোর ফলে গরুর যে ওজন বৃদ্ধি হয় তা এ প্রযুক্তির ফলাফল। খামারী সমস্যা ও চাহিদার ওপর নির্ভর করে এ ধরনের ফলাফল প্রদর্শনী করা হলে খামারীগণ উৎসাহিত হবে।

(খ) পদ্ধতি প্রদর্শনীঃ

যখন সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে কোন প্রযুক্তি বা কৌশল এক বা একাধিক খামারীকে হাতে কলমে শেখানো বা দেখানো হয় তাকে পদ্ধতি প্রদর্শনী বলা হয়। পদ্ধতি প্রদর্শনী একটি দলীয় (গ্রুপ) সম্প্রসারণ পদ্ধতি, যা এক হতে দু-ঘন্টা স্থায়ী হতে পারে। তবে পদ্ধতি প্রদর্শনীর বিষয়ে খামারীদের চাহিদা বা সমস্যার ভিত্তিতে চিহ্নিত কতে হবে। এ পদ্ধতিতে একটি বিশেষ দক্ষতা ধাপে ধাপে প্রদর্শন

করে এবং অংশগ্রহণকারীদের অনুশীলন করতে সাহায্য করে, যেমন সাইলেজ প্রস্তুতকরণ। এ পদ্ধতিটি অংশগ্রহণমূলক এবং খামারীগণ সাইলেজ প্রস্তুত করণ প্রযুক্তি পদ্ধতিটি এক হতে দু-ঘন্টার মধ্যে হাতে-কলমে শিখতে সমর্থ হয়। পদ্ধতি প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী উৎপাদন খরচ ও আয়ের ১টি হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রদর্শনীর জন্য সংক্ষিপ্ত খামারী প্রশিক্ষণ/ব্রিফিং:

প্রদর্শনী বাস্তবায়নের পূর্বে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য, প্রদর্শনী থেকে কী অর্জন করতে চাওয়া হচ্ছে এবং কীভাবে তা বাস্তবায়িত হবে তা প্রদর্শনী পরিচালনাকারী খামারীদের পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হবে। তাই এ সম্পর্কে প্রদর্শনী পরিচালনাকারী খামারীকে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ/ব্রিফিং দিতে হবে। এটা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা একই ধরণের প্রদর্শনী বাস্তবায়নকারী সকল খামারীকে একটি অধিবেশনে ঐ প্রদর্শনী সমন্ধে অবহিত করতে পারেন।

প্রদর্শনীর সফল বাস্তবায়নের জন্য জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- প্রদর্শনী বাস্তবায়নের পূর্বে সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং এর দিনেই খামারীকে উক্ত প্রদর্শনীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করতে হবে।
- প্রদর্শনী প্লট নিয়মিত পরিদর্শন ও প্রদর্শনী পরিচালনাকারী খামারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে।
- প্রত্যেকটি প্রদর্শনীর জন্য একটি রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে, যেখানে প্রদর্শনীর বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সব ধরণের তথ্য যথা প্রয়োগের তারিখ, প্রয়োগ পদ্ধতি, উপকরণ, সমস্যা ও উত্তরণের উপায়, ফলাফল, আয়-ব্যয়, প্রদর্শনী পরিদর্শনকারীর পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- প্রদর্শনী খামার/প্লট নিয়মিত পরিদর্শন ও প্রদর্শনী পরিচালনাকারী খামারীর সাথে সাক্ষাৎ করা।
- প্রদর্শনী স্থানে অন্যান্য সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- প্রতিটি প্রদর্শনীর ছবি তুলে ছবির নিচে উক্ত প্রদর্শনীর তারিখ, স্থান উল্লেখ পূর্বক ছবিটি উপজেলায় সংরক্ষণসহ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর ই-মেইলে পাঠাতে হবে।
- প্রদর্শনী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে হবে।

প্রযুক্তি প্রণয়নকালে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কী প্রদর্শনী হবে এবং কখন করা হবে। এ পরিকল্পনায় কোনটি সবচেয়ে উপযোগী প্রদর্শনী তা যাচাই করে নির্বাচন করতে হবে। তারপর প্রদর্শনীর সময়সূচি ঠিক করতে হবে।

প্রযুক্তি প্রদর্শনীর সাইন বোর্ড যেভাবে প্রস্তুত করতে হবে :

---------- **প্রদর্শণী**		
১।	**খামারী সংগঠনের (BG) এর নাম**	ঃ
২।	**খামারীর নাম**	ঃ
৩।	**প্রযুক্তির নাম**	ঃ
৪।	**শুরুর তারিখ**	ঃ
বাস্তবায়নে ঃ উপজেলা প্রণিসম্পদ দপ্তর, ----------প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।		

বিঃ দ্রঃ

- প্রতিটি প্রযুক্তি প্রদর্শনীতে একটি করে প্রদর্শনীর সাইনবোর্ড থাকবে।
- প্রযুক্তি প্রদর্শনীর সাইবোর্ডের মাপ হবে ঃ ৩ ফিট X ২ ফিট ।
- প্রকল্প এলাকায় প্রযুক্তি প্রদর্শনীর সকল সাইন বোর্ড এর রং ও ডিজাইন একই প্রকার করতে হবে। তাই একই প্রকার সাইন বোর্ড করার জন্য অত্র প্রকল্পের ওয়েব সাইটে "প্রযুক্তি প্রদর্শনীর সাইবোর্ডের নমুনা" প্রদর্শন করা আছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়ন ঃ

সাধারণত দক্ষতা সম্পন্ন মানুষকে মানবসম্পদ বুঝায়।

মানবসম্পদ উন্নয়ন হলো এমন একটি আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্দেশক যা ব্যাক্তির সামাজিক মর্যাদা বা অবস্থান নির্ধারণ করে। এটি মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল, শিশু মৃত্যু হার হ্রাস, এবং শিক্ষার বৃদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি এমন একটি উন্নততর অবস্থানের নাম যেখানে প্রতিটি ব্যাক্তি তার সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ এবং যথাযথ কর্মশক্তি নিয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সেবাগুলো যেমন-নূন্যতম আহার, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, চিত্ত-বিনোদন, ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণ করে মানসম্মত জীবন নিশ্চিত করে।

প্রশিক্ষণ ঃ

প্রশিক্ষণ হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়নের সর্বাধিক কার্যকর হাতিয়ার। প্রতিষ্ঠানিক কাজে মানব সম্পদকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হলে তাদের দক্ষতা ও উপযুক্ততা থাকলেই চলবে না। বরং কিভাবে তারা সে দক্ষতা ও উপযুক্ততাকে প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগাতে পারে সেদিকেও নজর দিতে হবে। মানবসম্পদ নির্বাচন ও নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাকে অনেক কিছুর সাথে বিবেচনা করতে হয়। এক্ষেত্রে একমাত্র প্রশিক্ষণই সকল সীমাবদ্ধতাকে দূরীভূত করে দক্ষ ও উপযুক্ত মানব সম্পদ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে। দেশ যত দ্রুত উন্নয়ন হচ্ছে তত প্রযুক্তির পরিবর্তন ঘটছে ফলে পুরানো কর্মীদের পুনঃপ্রশিক্ষণের প্রয়োজন ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে । তাই নতুন পুরানো সকল কর্মীর ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণ সমানভাবে প্রযোজ্য।

মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায় সমূহ:

১. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা: প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাঠামোর মাধ্যমিক শিক্ষা এবং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ পর্যায়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে।

২. কর্মকালীন প্রশিক্ষণ: ধারাবাহিক বা উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা।

৩. আত্ম উন্নয়ন: যেমন– জ্ঞান, দক্ষতা ও সামর্থ্যের উন্নয়ন যা ব্যক্তি তার নিজের চেষ্টায় আনুষ্ঠানিক উপায়ে অথবা দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে অনানুষ্ঠানিক উপায়ে পড়ে বা অন্যের কাছ থেকে শিখে নিজের আগ্রহ ও কৌতূহল অনুযায়ী ব্যাপক গুণমান, দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করে।

৪. স্বাস্থ্য উন্নয়ন: উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং মানব স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মরত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য উন্নয়ন।

৫. পুষ্টি উন্নয়ন: পুষ্টি মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে মানুষ অধিক সময় ধরে কাজ করতে পারে এবং তার কর্মজীবন দীর্ঘ হয়। পুষ্টির উন্নয়ন মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

৬. শিক্ষার সম্প্রসারণ।

৭. নৈতিকতাবোধ জাগ্রতকরণ এবং বিবেক-বিবেচনাবোধ সম্পন্ন মানুষ গঠন, দেশপ্রেমের দীক্ষা গ্রহণ, ব্যক্তিগত দক্ষতা উন্নয়ন এবং শুদ্ধাচার, শিষ্টাচারের সঠিক অনুশীলনই মানুষকে সম্পদে উন্নীত করে।

সমন্বয় (Co-ordination)

সমন্বয়ক ঃ যিনি জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে,বিভিন্ন বিভাগের বা কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে অথবা বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন, তাকে সমন্বয় সাধনকারী,সমন্বয়কারী বা সমন্বয়ক বলে। সমন্বয়ক তাকেই বলে যিনি প্রশ্ন,উত্তর ও মন্তব্য অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করার পাশাপাশি অন্যান্য কার্যক্রম করে বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। তিনি জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। বিভিন্ন বিভাগের বা কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। যিনি বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রমের মধ্যে সংগতি, সামঞ্জস্য বজায় রেখে লক্ষ্যকে বহুদূর এগিয়ে নিতে পারে তিনি ভাল সমন্বয়ক।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এক ধরনের একীভূত যোগাযোগ ব্যবস্থা। টেলিযোগাযোগ, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং তথ্যসম্পর্কিত এন্টারপ্রাইজ সফটওয়্যার, মিডলওয়্যার তথ্য সংরক্ষণ, অডিও-ভিডিও সিস্টেম ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী খুব সহজে তথ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে পারে তাকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলা হয়।

সরকারি কার্যক্রম বাস্তবায়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ

সরকারি কার্যক্রম বাস্তবায়নে এখন ই-নথি এবং ওয়েবসাইট ব্যবহার করা হচ্ছে। যার ফলে দ্রুত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। কম্পিউটার, ই-মেইল, স্কেনার মেশিন, প্রিন্টার মেশিন, বারকোড রিডার, ই-উপস্থিতি মেশিন, ট্যাবলেট, এনড্রয়েট ও আইওএস স্মার্টফোন ইত্যাদি যন্ত্রপাতি দাপ্তরিক কাজে ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে।

মোবাইল স্মার্ট ফোন এর পরিচিতি, ব্যবহারঃ

স্মার্টফোন হলো ৫ থেকে ৭ ইঞ্চি পরিমাপের ছোট এমন একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যাতে কম্পিউটারের কাজটি করা সম্ভব।

স্মাটফোনের ব্যবহার:

- ✓ উচ্চমানের ছবি তোলতে স্মার্টফোন ব্যবহার করা হয়।
- ✓ ইন্টারনেট ব্রাউজিং করা যায়,
- ✓ মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি এবং ই-মেইল করা যায়।
- ✓ সামাজিক যোগাযোগ (ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম, টুইটার) মাধ্যম ও ভিডিও (ইউটিউভ) শেয়ারিং সাইট ব্যবহার করা যায়।
- ✓ স্মার্টফোনে ঘড়ি, আবহাওয়া বার্তা, ই-বুক পড়া, অনলাইন শপিং, বিভিন্ন গেইম, টিকেট কাটা, রেল টিকেট কাটা, ওয়ার্ড প্রসেসিং করা, সংবাদপত্রের অনলাইন ভার্সন ইত্যাদি সংযুক্ত করায় মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে আরো সহজ ও আনন্দময়।

ইন্টারনেট পরিচিতি

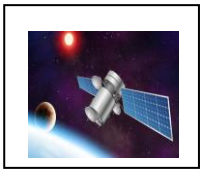

ইন্টারনেট ঃ

ইন্টারনেট হলো পৃথিবী ব্যাপী বিস্তৃত পরস্পরের সাথে সংযুক্ত অনেকগুলো কম্পিউটার ও সার্ভার নেটওয়ার্কের সমষ্টি যা সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত। ইন্টানেট প্রটোকল নামের এক প্রামাণ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে এখানে তথ্য আদান প্রদান করা হয়।

ওয়েবসাইট ঃ

ওয়েবসাইট বা ওয়েব সার্ভার হলো ওয়েব পৃষ্টা, ছবি, অডিও, ভিডিও ও অন্যান্য ডিজিটাল তথ্যের সমষ্টিকে বোঝায়, যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যায়। এটি একটি এইচটিএমএল ডকুমেন্ট যা এইচটিটিপি প্রটোকলের মাধ্যমে ওয়েব সার্ভার থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ওয়েব ব্রাউজারে স্থানান্তরিত করে ব্যবহার করে থাকে।

ওয়েব ব্রাউজার

ওয়েব ব্রাউজার হলো এমন একটি সফটওয়্যার যার মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী যেকোন ওয়েবপেইজ, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে অথবা ওয়েবসাইটের যেকোনো লেখা, ছবি এবং অন্যান্য তথ্যের অনুসন্ধান, ডাউনলোড কিংবা দেখতে পারেন। কোনো ওয়েবসাইটে অবস্থিত লেখা এবং ছবি একই অথবা ভিন্ন ওয়েবসাইটের সাথে আন্তসংযুক্ত (হাইপারলিংক) থাকলে একটি ওয়েব ব্রাউজার একজন ব্যবহারকারীকে দ্রুত এবং সহজে এইসকল লিঙ্কের মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে অবস্থিত অসংখ্য ওয়েবপেইজের সাথে তথ্য আদান-প্রদানে সাহায্য করে। এভাবে ওয়েবপেইজের ভিতরকারের লেখা, ছবি, ভিডিও ইত্যাদির মধ্যে চলাচল করাকে ব্রাউজিং বরে।

নেতৃত্ব, জেন্ডার ও নারীর ক্ষমতায়ন

নেতার সংজ্ঞা:

সাধারণত: একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য জনগণকে যিনি পরিচালনা করেন তিনিই নেতা। পারস্পারিক সম্পর্ক বজায় রেখে একটি সংগঠিত গোষ্ঠী বা দলকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে যিনি পথ চলার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, সহযোগীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগান এবং সর্বোপরি পরিচালনা করেন তাকেই নেতা বলে।

নেতার কাজ:

- দলের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করা।
- দলের ঐক্য ও আদর্শ রক্ষা করা।
- আর্থিক লেনদেন ও হিসাব রাখতে সাহায্য করা।
- দলের সভা পরিচালনা করা।
- দলের কাগজপত্র ও সম্পদ রক্ষা করা।
- সদস্যদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখা।

জেন্ডার ও লিঙ্গ ঃ

সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যাকার বিদ্যমান পার্থক্যকে চিহ্নিত করতে সমাজবিজ্ঞানীরা জেন্ডার শব্দটিকে ব্যহার করেন। আর তাই জেন্ডার এবং লিঙ্গকে আপাত: দৃষ্টিতে সমার্থক মনে হলেও এর ব্যবহারিক পার্থক্য অনেক।

লিঙ্গ ও জেন্ডার:

লিঙ্গ বা সেক্স হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক কারণে সৃষ্ট নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যসূচক বিভিন্নতা বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের স্বাতন্ত্র্যতা কিংবা শরীরবৃত্তীয়ভাবে নির্ধারিত নারী পুরুষের বৈশিষ্ট্য যা জন্মগত এবং অপরিবর্তনীয়।

জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের পরিচয়; সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত নারী পুরুষের ভূমিকা যা পরিবর্তনীয় এবং সমাজ সংস্কৃতি ভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

নারীর ক্ষমতায়ন

সামাজিক অসমতা ও বৈষম্য দূরীকরণে নারীকে পুরুষের সমকক্ষতায় সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার নামই নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়ন বলতে প্রথম দুটি বিষয় বিবেচ্য- (১) নারীর অবস্থা ও (২) নারীর অবস্থান। নারীর অবস্থা বলতে বুঝায় নারীর বস্তুগত অবস্থা, যেমন পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উপার্জন। দ্বিতীয়ত নারীর অবস্থান বলতে বুঝায়, সরাসরি ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ, সম্পদের মালিকানা, অধিকতর পছন্দ অপছন্দ, অগ্রাধিকার, মর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নেনারীর অংশগ্রহন,নিজের সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত করার অধিকার সক্ষমতা বা যোগ্যতা এবং ন্যায্য সুযোগ অর্জন।

নারীর ক্ষমাতয়নে জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নারীর সরাসরি অংশ গ্রহন নিশ্চিত করতে হবে।

এই প্রক্রিয়ায় রয়েছে ঃ

ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় নারী

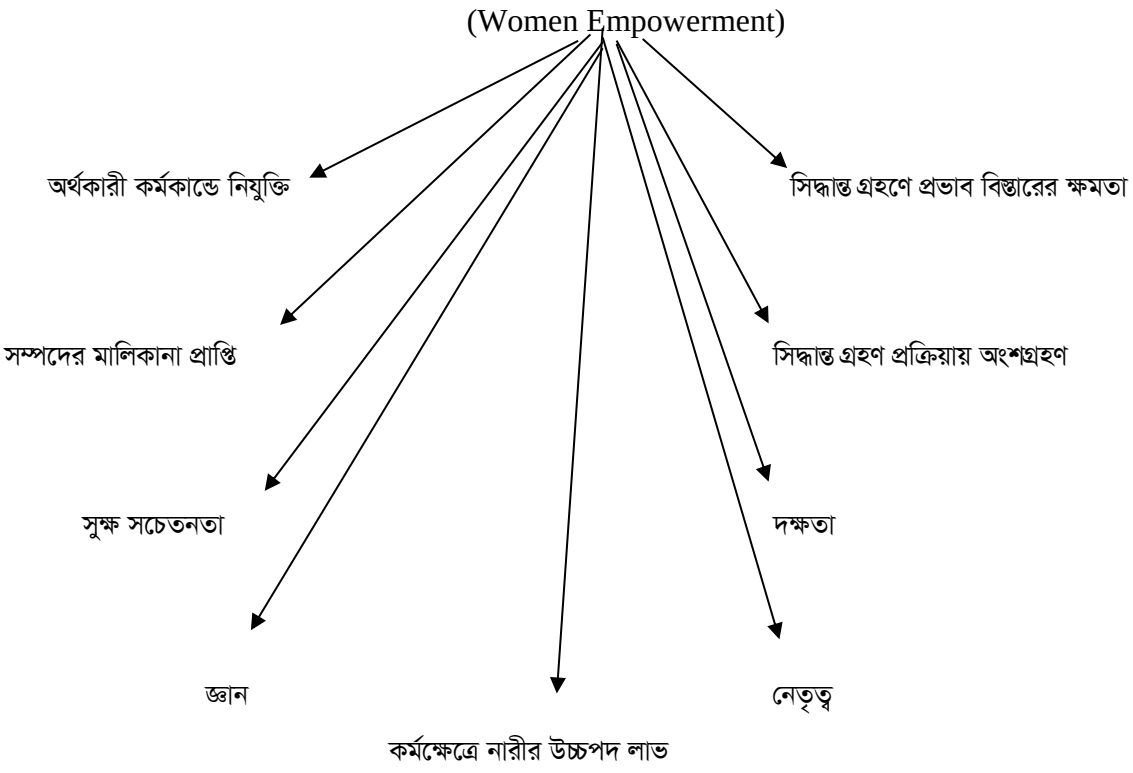

দল গঠন ও সংগঠন ব্যবস্থাপনা

দল

দল বলতে এই শ্রেণীর বা পেশার অথবা একই গোত্রের কয়েকজন মানুষ মিলিত হয়ে নিজের উন্নয়নের জন্য সংঘবদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করাকে বুঝায়। কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কাজ করার জন্য সমমনা কিছু লোকের সমস্টিকে দল বলে। কোন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সাধারনত একটি বড় দলকে পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য। তাছাড়া দল বড় হলে দলের প্রত্যেক সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় না। পাশাপাশি সহায়তাকারী প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর সাথে ঘনিষ্টভাবে থেকে শেখাতে পারেন বা সহায়তা করতে পারেন।

দল ব্যবস্থাপনা:

- ❖ এমন একটি কার্য ব্যবস্থাকে বুঝায় যার মাধ্যমে দলসমূহ সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হয়।
- ❖ দল যে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত হয় তাকে দল ব্যবস্থাপনা বলে।
- ❖ যে প্রক্রিয়া দলের প্রতিটি কর্মকান্ডকে পরিচালিত করে তাকেই দল ব্যবস্থাপনা বলে।
- ❖ দলের লক্ষ্য অর্জনের জন্য দল যেভাবে কাজ করে/ পরিচালিত হয় তাই দল ব্যবস্থাপনা।

দল ব্যবস্থাপনা কাঠামো

দলের ব্যবস্থাপনার কাঠামোকে সাধারণত: ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

১) সাধারণ সদস্য

২) কার্য -নির্বাহী পরিষদের সদস্য।

১) সাধারণ সদস্য: দলের প্রত্যেক সদস্যই হচ্ছেন সাধারণ সদস্য। প্রত্যেক সদস্যদের সমান অধিকার আছে। দলের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও সাধারণ সদস্য। এক কথায় সাধারণ সদস্য বলতে আমরা বুঝি একটি দলের প্রত্যেক সদস্যকে।

২) কার্য নির্বাহী পরিষদের সদস্য: দলের সকল সদস্য মিলে বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য নিয়ে যে কমিটি গঠন করা হয় তাদেরকে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য বলা হয়। এদের দায়িত্ব হলো দলকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। এই পরিষদের সদস্যরা তাদের কাজের জন্য অন্য সদস্যদের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। দলের বিধিমালার উপর নির্ভর করবে কার্যনির্বাহী পরিষদ। মেয়াদকাল শেষ হলে সদস্যদের ভোটে পুনরায় কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়।

দল পরিচালনার কৌশল ঃ

- ✓ দল পরিচালনার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে সম্মত থাকা।
- ✓ দলের সহকর্মীদের সাহায্য করার মনোভাব থাকা।
- ✓ সাফল্যের জন্য দলের সদস্যদের স্বীকৃতি দেয়।
- ✓ সাফল্যের সুনাম সকলের সাথে ভাগ করে নেওয়া।
- ✓ সহকর্মীদের সাথে সব সময় নিজের কাজের সমন্বয় করা।
- ✓ দলের সদস্য হিসেবে কাজ করতে অবশ্যই পছন্দ করতে হবে।
- ✓ গণতান্ত্রিক দল ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশ্বাস
- ✓ দলের ঐক্য বজায় রাখা ইত্যাদি।

দলের গঠনতন্ত্র তৈরীর নিয়মাবলী:

- ✓ দল গঠন হওয়ার প্রথম বছরের মধ্যেই গঠনতন্ত্র তৈরী করা প্রয়োজন।
- ✓ সভায় গঠনতন্ত্র তৈরীর জন্য সহায়ক প্রশ্নাবলী নিয়ে আলোচনা করা দরকার।
- ✓ উন্নয়নকর্মী সরাসরি প্রশ্নের উত্তর বলে দেবেন না। তাঁরা নিজেরা যাতে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান সে জন্য সাহায্য করবেন।
- ✓ প্রত্যেক সদস্য যাতে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর সময় নিয়ে চিন্তা করে দিতে পারেন সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।
- ✓ কোন প্রশ্ন বোঝা না গেলে উন্নয়নকর্মী উদাহরণসহ প্রশ্নের উত্তর বুঝিয়ে দিবেন।
- ✓ দলীয় সভায় অধিকাংশ সদস্যই যেন উপস্থিত থাকেন সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।
- ✓ সবাই একমত হয়ে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্নের উত্তর লিখবেন।
- ✓ যে কোন একজন লেখাপড়া জানা সদস্য প্রশ্নপত্র পূরণ করবেন।
- ✓ দলীয়ভাবে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে গঠনতন্ত্রটি চুড়ান্ত রূপ লাভ করবে।
- ✓ চুড়ান্ত গঠনতন্ত্রের শেষ পৃষ্ঠায় প্রত্যেক সদস্যের সম্মতিসূচক স্বাক্ষর থাকবে।

রেজিস্ট্রেশন

রেজিস্ট্রেশন হলো তালিকাভুক্তিকরণ। নির্দিষ্ট আইনের অধীনে তালিকাভুক্ত হলে এটি সরকারের একটি অংশে পরিনত হয়।

রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা

- ✓ রেজিস্ট্রেশন হলো একটি সরকারী স্বীকৃতি।
- ✓ ক্লাব বা সমিতি পরিচালনায় জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও উপযুক্ত হিসাব সংরক্ষণে বাধ্যবাধকতা থাকবে।
- ✓ সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন থাকলে সরকারী ও সেবরকারী সংস্থা হতে আর্থিক সহায়তা, অনুদান ইত্যাদি পাওয়া সহজ হয়।
- ✓ যতদিন আইনের বিধান অনুযায়ী বিলুপ্তি না ঘটে ততদিন এর অস্তিত্ব বজায় থাকবে।

রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর আওতায় রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ।

১। সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর ৫ নং বিধি অনুযায়ী ফরম নং-১ অনুসারে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন পত্র। (নূন্যতম ২০ জন সদস্যের স্বাক্ষরসহ, প্রত্যেকের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর এবং প্রতি সদস্যের কমপক্ষে ৪০ শতাংশ জমি থাকতে হবে।)
২। প্রাথমিক সমিতি হিসেবে রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ৩০০/- টাকার ট্রেজারী চালান।
৩। সমিতির নাম হবে প্রাণিসম্পদ সমবায় সমিতি।
৪। প্রথম সাধারণ সভার রেজুলেশন। সমিতির নামকরণ, সদস্য সংখ্যা, ২টি আর্থিক বছরের বাজেট, কোন ব্যাংকে একাউন্ট খোলা হবে ও কে/কারা পরিচালনা করবে তা রেজুলেশনে থাকতে হবে।
৫। ব্যাংক একাউন্ট।
৬। সমিতির ৩ (তিন) কপি উপ আইন (গঠনতন্ত্র)
৭। প্রাথমিক সমিতি হিসাবে ৩০০০/- টাকার পরিশোধিত শেয়ার এবং ৩০০০/- টাকার সঞ্চয় দেখাতে হবে এবং মূলধন সংক্রান্ত শেয়ার হোল্ডারদের তালিকা। (প্রতি সদস্যকে শেয়ার কিনতে হবে)।
৮। প্রাথমিক সমবায় সমিতি পরিচালনার জন্য পরবর্তী ২ সমবায় বর্ষের বাজেট।
৯। কার্যনির্বাহী কমিটি ৬, ৯ বা ১২ সদস্য বিশিষ্ট অর্থাৎ ৩ দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে।
১০। সদস্যদের পরিচিতি হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সনদপত্র।
১১। দুই বছর অন্যের সাহায্য ছাড়া সমিতি পরিচালনার অঙ্গীকারনামা।

পশু-পাখির রোগ দমন ও জীবনিরাপত্তা

পশু-পাখির রোগ দমনের মূলনীতি:

১. প্রতিরোধ: খামারে রোগ হতে না দেয়া। যেমন: টীকা প্রদান
২. রোগ দমণ/ হ্রাসকরণ: কোন খামারে রোগের বিস্তারকে কমিয়ে নিয়ে আসা।
৩. রোগ অপসারণ: রোগের ব্যাপকতাকে এমন পর্যায়ে কমিয়ে নিয়ে আসা যেখানে লাখে ১ টি পশু /পাখি রোগে আক্রান্ত হয়।
৪. নির্মূল/উচ্ছেদ : রোগের ব্যাপকতাকে শূণ্যের কোঠায় নামিয়ে নিয়ে আসা/ চিরতরে নির্মূল করা।

১) রোগের ধারকের নিয়ন্ত্রণ:

ক) প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রথমধাপ
খ) স্থানীয় স্বাস্থ্য- প্রশাসন ও কর্মীর মাধ্যমে কোন রোগকে নোটিশ করা
গ) ইপিডিমিওলজিক্যাল পর্যবেক্ষন-
- ✓ সংক্রমনের উৎস নির্ণয়করণ
- ✓ সংক্রমনের উপাদান নির্ণয়করণ, যেমন- পরিবেশ, জনসংখ্যা

ঘ) পৃথকিকরণ: রোগ বিস্তারের সময়ে রোগ আক্রান্তপশু-পাখিকে পৃথক করে রাখা।
ঙ) চিকিৎসা: চিকিৎসার মাধ্যমে জীবানুকে ধ্বংস করা।
চ) সঙ্গ নিরোধ: রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য সম্ভাব্য রোগ আক্রান্ত (অনুমেয়) পশু-পাখিকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথক করে রাখা

২) রোগ বিস্তারে বাধা প্রদান:

রোগ বিস্তারের চেইনকে ভেঙ্গে ফেলা-
রোগের উৎস:

- ❖ পশু থেকে পশু
- ❖ পরিবেশ- মাটি, পানি, খাদ্য
- ❖ পশু থেকে মানুষ
- ❖ মানুষ থেকে পশু

৩) সংক্রামক রোগ ছড়ানোর মাধ্যম:

১. স্পর্শ: বেশকিছু রোগ এভাবে ছড়ায়। যেমন: স্কেবিস, ছত্রাকজনিত চর্মরোগ।
২. যৌন সংস্পর্শ: এইডস, সিফিলিস, গনোরিয়া, হেপাটাইটিস (বি, সি), হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ইনফেকশন যেটি জরায়ু মুখ ক্যান্সারের অন্যতম কারণ, লিমফোগ্রানুলোমা ভেনেরিয়াম।
৩. খাদ্য ও পানীয়: টাইফয়েড, পোলিওমায়েলাইটিস, হেপাটাইটিস (এ, ডি), কলেরা, ডায়ারিয়া, আমাশয়, বিভিন্ন কৃমি সংক্রমণ।

৪. বায়ুবাহিত: যক্ষা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হুপিংকাশি, মেনিনজাইটিস, নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, ব্রংকিওলাইটিস, মাম্পস, রুবেলা, হাম।
৫. ভেক্টরবাহিত: মশা-ডেঙ্গি, চিকুনগুনিয়া, ইয়েলোফিভার, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়াসিস। মাছি উদরাময়, আমাশয়, কৃমি সংক্রমণ, কালাজ্বর।

বায়োসিকিউরিটি বা জীব নিরাপত্তা কী?

বায়োসিকিউরিটি বা জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা হচ্ছে একটি যৌথ ব্যবস্থাপনা যা নানা ধরনের কাজকর্মের মাধ্যমে একটি খামারের মধ্যে অথবা আন্ত:খামানের মধ্যে অথবা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে রোগ জীবাণুর বিস্তার প্রতিরোধ করে।
বায়োসিকিউরিটি হ'ল প্রথম লাইনের প্রতিরক্ষা যা খামারে প্রবেশ করা নতুন রোগ প্রতিরোধ করে তাই বায়োসিকিউরিটি লঙ্ঘন হলে খামারে রোগের প্রবর্তনের ফলে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।
খামারের জীব নিরাপত্তা বজায় রাখতে করনীয়-

- গবাদিপ্রাণির সংখ্যা অনুপাতে পর্যাপ্ত জায়গাসহ বাসস্থান তৈরী করতে হবে।
- গবাদিপ্রাণির বাসস্থান শুকনো এবং পর্যাপ্ত আলো-বাতাসযুক্ত স্থানে তৈরী করতে হবে। স্যাঁতস্যাতে অবস্থা মুক্ত করা।
- গবাদিপ্রাণির খামার বন্য প্রাণি বা অন্যান্য আক্রমনকারী প্রাণির হাত হতে সুরক্ষিত হতে হবে।
- খামারে অনুপ্রবেশ সংরক্ষিত হতে হবে।
- খামারে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে
- খামারের খাদ্য গুদাম আধুনিক হতে হবে
- খামারের খাবার পাত্র, পানির পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- খামারে সংগ নিরোধের জন্য কোয়রেনটাইন কক্ষ রাখা গেলে রোগ ব্যবস্থাপনার বিশেষ উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে
- নতুন গবাদিপ্রাণির খামারে সংযোজন করার ক্ষেত্রে কোয়ারেনটাইন করে প্রয়োজনীয় টিকা প্রদান করে অন্য গবাদিপ্রাণির সাথে মিশতে দিতে হবে
- খামারের কোন প্রাণি অসুস্থ হলে তাকে আইসোলেশন সেডে রেখে চিকিৎসা করাতে হবে।
- খামারের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীকে নিয়মিত টিকা প্রদান করতে হবে।
- কোন গবাদিপ্রাণির মৃত্যু হলে তার সঠিক ডিসপোজাল ও ডিসইনফেকশন নিশ্চিত করতে হবে
- বিশুদ্ধ ও জীবানুমুক্ত পানি ও খাবার সরবরাহ করা।
- খামারের বাসস্থান, যন্ত্রপাতি, ব্যবহার্য্য উপকরন সিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- পোকামাকড় ধবংস করা।
- জীবানু ধবংসের বিভিন্ন পদ্ধতি যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা।
- খামারে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত পোশাক ও জুতা জীবানুমুক্ত করে পরিধান করতে হবে।
- বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন খামারের জীব-নিরাপত্তা উন্নয়নে এবং জ্বালানী খরচ সাশ্রয়ে ভূমিকা রাখবে
- মুরগীর খামারে অল ইন অল আউট পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে। খামারে ২টি ব্যাচের মুরগি একই সাথে পালন করা যাবে না।
- খামারের প্রবেশপথে ফুটবাথ থাকতে হবে যাতে এন্টিসেপটিক মিশ্রিত পানি থাকতে হবে।
- খামারের অভ্যন্তরে মৃত মুরগির পোষ্টমরটেম পরীক্ষা করা যাবে না। পোষ্টমরটেম পরীক্ষা অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে করাতে হবে।
- ভেটেরিনারিয়ান ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়ে খামারে ঔষধ প্রয়োগ করা যাবে না।

জীবাণুমুক্ত করনের উদ্দেশ্য

- বিভিন্ন প্রকারের রোগ বালাই প্রতিরোধ করা।
- রোগবালাই জনিত ক্ষতি হ্রাস করে খামারকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নিত করা।

জীবাণুমুক্ত করনের বিভিন্ন পদ্ধতি ঃ

ফিউমিগেশন

সাধারনত ফরমালিন ও পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট মিশিয়ে বিষাক্ত ধোঁয়া তৈরি করে জীবাণুনাশ করার পদ্ধতিকে ফিউমিগেশন বলে।
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঃ

- প্রতি ১০০ বর্গফুট জায়গার জন্য-
- ফরমালিন- ৫২.৫ গ্রাম,
- পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট- ১০৫ গ্রাম
- মাটির পাত্র- যে পরিমান ঔষধ হবে তার দ্বিগুন বেশি ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ও চ্যাপ্টা হবে।

পদ্ধতি ঃ

- ঘরের জানালা দরজা ভালভাবে বন্ধ করে নিতে হবে।
- যে ব্যক্তি ফিউমিগেশন করবেন তাকে রাবারের হাতমোজা ও মুখে মাস্ক পরে নিতে হবে।
- মাটির পাত্রে ফরমালিন দিয়ে তাতে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট মিশাতে হবে।
- এ অবস্থায় ২৪ ঘন্টা রেখে দিতে হবে।
- তারপর ঘরের জানালা দরজা খুলে দিতে হবে এবং ধোয়া সম্পূর্ন রূপে বের হলে ঘরটি ব্যবহার করতে হবে।

ফুটবাথ ব্যবহার ঃ

খামারের ঢোকার পথে জীবাণুনাশক দিয়ে পা ধৌত করণের পদ্ধতিকে ফুটবাথ বলে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঃ

পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট- ০.০১% দ্রবণ

পদ্ধতি ঃ

- খামারে ঢোকার পথে আয়তাকার ৩-৪ ইঞ্চি গভীর গর্ত করে সিমেন্ট দিয়ে আস্তর দিতে হবে।
- এই গর্তে ০.০১% পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট দ্রবণ ঢেলে দিতে হবে।
- খামারে প্রবেশকারী এই দ্রবণে পা চুবিয়ে খামারে প্রবেশ করবে।
- এই পদ্ধতি জুতা বা পায়ে লেগে থাকা রোগজীবাণু ধবংস হয়।

মুরগি পালন

ক্ষুদ্র খামারে মুরগি পালনের উদ্দেশ্য ঃ

- দুস্থ, কর্মহীন ও বিধবা মহিলাদের কর্মসংস্থানে সাহায্য করা
- প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করা
- পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা
- মুরগির ডিম এবং মুরগি বাজারে বিক্রি করে বাড়তি অর্থ দিয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
- খামারীগণ ঘরে বসে স্বল্প পুজি খাটিয়ে অধিক লাভবান হতে পারে

মুরগির খামার স্থাপনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় সমূহঃ

- খামার তৈরীর জন্য নির্বাচিত স্থান লোকালয়/আবাসিক ঘনবসতি এলাকা হতে দূরে শুষ্ক, উচু, সুষ্ঠু পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিদ্যমান এমন স্থান হতে হবে
- যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে
- পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে
- বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা থাকতে হবে
- আশেপাশে পঁচা ডোবা ও নর্দমা মুক্ত হতে হবে
- বাজারজাতকরণের সুবিধা থাকতে হবে

মুরগির জাত পরিচিতি ঃ

জাত ঃ সাধারণ দেশী

প্রাপ্তি স্থান ঃ বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। সচরাচর যে সকল মোরগ-মুরগি গ্রামে গঞ্জে, হাটে বাজারে দেখা যায়, তার প্রায় সবই এ জাতের অন্তর্ভূক্ত।

দেশী মুরগি

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ এই জাতের মেরাগ-মুরগি নির্দিষ্ট কোন রংএর অন্তর্ভুক্ত হয় না। তথাপি পর্যায়ক্রমে নিয়মতান্ত্রিক বাছাই এর মাধ্যমে লালচে বাদামি বা লালচে কালো রং এর মুরগি বর্তমানে সংখ্যায় বেশী পাওয়া যায়। তবে কালো এবং সোনালী রংয়ের মুরগিও আছে। এদের পা লোমহীন ও পায়ের নলা সাদাটে। তবে কালো রংয়ের পায়ের নলাও দেখা যায়। চামড়া হলদেটে। একক ঝুঁটি বিশিষ্ট এবং ঝুঁটির রং লাল। তবে বাদামী বা ধুসর বর্ণের ঝুঁটিও দেখা যায়। সাদা এবং লালের মিশ্রণযুক্ত কানের লতি বেশী দেখা যায়। একটি পূর্ণ বয়স্ক মোরগের ওজন ১.৫ কেজি হতে ২.৫ কেজি এবং মুরগির গড় ওজন ১.২-২.০ কেজি। বৎসরে প্রতিটি মুরগি গড়ে ৬০-৯০ ডিম দেয়। প্রতিটি ডিমের ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম। ডিমের রং হালকা সাদা থেকে গাঢ় বাদামী। মুরগি ডিম পাড়া শেষে ডিমে তা দিতে বসে। তবে ইনটেনসিভ সিস্টেম বা আবদ্ধ অবস্থায় পালনের জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি অনেকাংশে কমে গেছে। রোগ-বালাই কম হয়। দৈনিক গড়ে ৭৫-৮০ গ্রাম খাদ্য খায়। প্রথম ডিম পাড়ার বয়স ৫-৬ মাস।

জাত ঃ হিলি

প্রাপ্তি স্থান ঃ চট্টগ্রাম এলাকায় বিশেষ করে পার্বত্য এলাকায় এই জাতের মুরগি পাওয়া যায়। বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি অঞ্চলের এই জাতের মুরগি পাওয়া যায়।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ এই জাতের মোরগ-মুরগি সাধারণত সাদার মধ্যে কালো ছিটাযুক্ত হয়ে থাকে। তবে ধূসর এবং লালচে মুরগিও দেখা যায়। এই জাতের মুরগি তুলনামূলকভাবে দেশী জাতের মুরগি হতে বড় হয়ে থাকে। একক ঝুঁটি বিশিষ্ট এবং ঝুঁটির রং লাল। তবে বাদামী বা ধুসর বর্ণের ঝুঁটিও দেখা যায়। এদের পা লোমহীন ও পায়ের নলা সাদাটে। তবে হলুদ এবং কালো রংয়ের পায়ের নলাও দেখা যায়।

হিলি মুরগি

চামড়া হলদেটে। সাদা এবং লালের মিশ্রণযুক্ত কানের লতি দেখা যায়। একটি পূর্ণ বয়স্ক মোরগ-মুরগির গড় ওজন যথাক্রমে ২.০ কেজি হতে ৩.৫ কেজি এবং ১.৫-২.০ কেজি। বৎসরে প্রতিটি মুরগি গড়ে ১৩০-১৪০ ডিম দেয়। প্রতিটি ডিমের ওজন ৪০-৪২ গ্রাম। ডিমের রং হালকা বাদামী। মুরগি ডিম পাড়া শেষে ডিমে তা দিতে বসে। তবে ইনটেনসিভ সিস্টেম বা আবদ্ধ অবস্থায় পালনের জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি অনেকাংশে কমে গেছে। রোগ-বালাই কম হয়। দৈনিক গড়ে ৮৫-৯০ গ্রাম খাদ্য খায়। প্রথম ডিম পাড়ার বয়স ৫-৬ মাস।

জাত ঃ আসিল

প্রাপ্তি স্থান ঃ বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সড়াইল এলাকায় এই ধরণের মুরগি দেখা যায়।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ এই জাতের মুরগ-মুরগি গাঢ় খয়েরী রংয়ের হয়ে থাকে। লোমহীন পা, দেশী মোরগ হতে ওজনে বেশী এবং লড়াইয়ের জন্য বিখ্যাত। একটি পূর্ণ বয়স্ক মোরগ-মুরগির গড় ওজন যথাক্রমে ২.৫-৪ কেজি এবং ১.৭-২.৫ কেজি। বৎসরে প্রতিটি মুরগি গড়ে ৩০-৩৫ ডিম দেয়। প্রতিটি ডিমের ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম। রোগ-বালাই কম হয়। দৈনিক গড়ে ১৩০ গ্রাম খাদ্য খায়। প্রথম ডিম পাড়ার বয়স ৮-১০ মাস।

আসিল মুরগি

জাত ঃ সোনালী

প্রাপ্তি স্থান ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এই ধরণের মুরগির খামার দেখা যায়।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ আমাদের দেশে ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত গবেষণার ফলে আর.আই.আর জাতের মোরগের সাথে ফাউমি জাতের মুরগির মিলনের মাধ্যমে সোনালী জাতের মুরগির সৃষ্টি করা হয়। এই জাতের মোরগের গায়ের রং সোনালীর মধ্যে কালো, পাখায় সাদা ফোটা ফোটা। মুরগির গায়ের রং হলুদ কালো। আকারে মাঝারি। ডিমের খোসা ক্রিম বর্ণের। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশী। ডিম উৎপাদনকারী জাত হিসেবে পরিচিত। এ জাত আমাদের দেশীয় আবহাওয়ায় পালনের উপযোগী। পূর্ণ বয়স্ক একটি মোরগ ও মোরগীর ওজন যথাক্রমে ২.০-২.৫ কেজি এবং ১.৫-২.০ কেজি। এদের বার্ষিক গড় ডিম উৎপাদন ১৫০-২০০ টি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে মাংস উৎপাদনের জন্য এ মোরগ-মুরগি পালনের পরিমান অধিক পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

সোনালী মুরগি

মুরগির বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনাঃ

বাচ্চা ফুটার পর থেকে ৪ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে বাচ্চা পালনকে ব্রুডিং বলে। ব্রুডিংকালে বাচ্চাকে সঠিক তাপমাত্রায় লালন পালন করতে হয়। সাধারণত ১ম সপ্তাহে ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট, ২য় সপ্তাহে ৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইট, ৩য় সপ্তাহে ৮৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট, ৪র্থ সপ্তায় ৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ব্রুডিং করতে হয়। ব্রুডিং এর জন্য

নির্ধারিত স্থানটি শুষ্ক ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনিয়। নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নির্ধারিত স্থানটি চিকগার্ড দ্বারা বেষ্টিত করতে হয়। উপরে একটি হোবার স্থাপন করতে হবে। হোবারে বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগানো থাকে। হোবারের অবস্থান উঠা-নামা করানোর মাধ্যমে চিকগার্ড এর অভ্যন্তরের তাপমাত্রা কমানো বা বাড়ানো হয়ে থাকে। সাধারণত ৭-৮ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট একটি জায়গায় ৪০০-৫০০ টি দেশী মুরগির বাচ্চার ব্রুডিং করা হয়ে থাকে।

ব্রুডিং এর উদ্দেশ্য ঃ

- ব্রুডিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই সময়টা সঠিকভাবে পালন করা গেলে খামারে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব
- সঠিক ব্রুডিং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক
- বিভিন্ন পীড়ন থেকে রক্ষা করা যায়
- সকল বাচ্চা সমভাবে বাড়তে থাকে
- বংশগত বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটে
- ভেক্সিনের কার্যকারীতা বেশী পাওয়া যায়

ব্রুডিং এর পূর্ব প্রস্তুতি ঃ

- বাচ্চা আসার ৬-৭ দিন আগেই মুরগি পালনের জন্য নির্বাচিত খামার/ঘর জীবানুমুক্ত করতে হবে, এক্ষেত্রে প্রথমে ঘরের অভ্যন্তরস্ত সকল পুরাতন মালামাল, লিটারসহ অন্যান্য উপাদান ঘরের বাহিরে স্থানন্তর করতে হবে
- এবার ঘরের পর্দা বের করে নিতে হবে, ঘরের ভেতর ও বাহিরের মাকরশার জাল থাকলে ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে
- ঘরের সকল উপকরণ ডিটারজেন্ট দিয়ে ভালভাবে ধৌত করতে হবে
- খামারের চারপাশে বাহিরে ৫ ফুট পর্যন্ত চুন ছিটাতে হবে এবং ডিসইনফেকটেন্ট ছিটাতে হবে
- এবার প্রথমে পরিষ্কার পানি দিয়ে খামারের মেঝে ভিজাতে হবে এবং ডিটারজেন্ট মিশানো পানি বা চুন পাউডার ছিটিয়ে ২৪ ঘন্টা রেখে দিয়ে পরবর্তীতে ভালোভাবে ঘষে মেঝে পরিষ্কার করতে হবে
- তারপর জীবানুনাশক মিশ্রিত পানি দিয়ে মেঝে পুণরায় পরিষ্কার করতে হবে এক্ষেত্রে জীবানুনাশক ছিটিয়ে কয়েক ঘন্টা রেখে দিয়ে পরবর্তীতে ভালভাবে ঘষে পরিষ্কার করে পরিষ্কার পানি দিয়ে খামারের সকল সারফেস পরিষ্কার করতে হবে
- এবার খামারে আয়োডিন বা অন্য কোন এন্টিসেপটিকস (উদাহরণসরূপ ঃ ভিরকন বা টিমসেন) দিয়ে স্প্রে করতে হবে, পরবর্তীতে ভালোভাবে ঘর শুকাতে হবে
- ঘর শুকিয়ে গেলে খামারে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ প্রবেশ করাতে হবে, উপাদানসমূহ প্রবেশের আগেই এগুলো ভালোভাবে ডিসইনফেকটেন্ট/এন্টিসেপটিক মিশ্রিত পানি দিয়ে অবশ্যই পরিষ্কার ও শুকিয়ে নিতে হবে
- এপর্যায়ে খামারের বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন ও পরীক্ষা করে নিতে হবে
- খামারে চিকগার্ড, হোভার স্থাপনের মাধ্যমে ব্রুডিং সরঞ্জাম স্থাপন করতে হবে
- বাচ্চা আসার ৩-৪ ঘন্টা আগে ব্রুডারের সকল সরঞ্জাম (লিটার, পেপার, হোভার, চিকগার্ড, খাবার পাত্র, পানির পাত্র, হোভারে বৈদ্যুতিক ভাল্ব লাগানো) নির্দিষ্ট স্থানে সংযোজন ও কার্যকারীতা নিশ্চিত হতে হবে
- বাচ্চা আসার ৩ ঘন্টা আগেই হোভারের লাইট চালু করতে হবে যাতে চিকগার্ডের অভ্যন্তরে তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কাছাকাছি পৌছাতে পারে

বাচ্চা মুরগি ব্যবস্থাপনা

ব্রুডিং ঃ

- বাচ্চা খামারে আসার ১ঘন্টা আগে পানির পাত্রে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে, যাতে পানির তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কাছাকাছি পৌছে, পানিতে ০.২৫% গ্লুকোজ (২৫ গ্রাম/লিটার) মিশানো যেতে পারে যা দুর্বল বাচ্চদেরকে সবল করে তুলবে।
- এবার খামারে আসা বাচ্চার বক্সসমূহ হোভারের নিচে স্থাপন করে কিছুক্ষণ (১০ মিনিট) রেখে দিতে হবে যাতে করে বাচ্চার গায়ের তাপমাত্রা ব্রুডিং তাপমাত্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠে, এক্ষেত্রে শুরুতেই বাচ্চার বক্স খামারে প্রবেশের সময় বক্স এর উপর এন্টিসেপটিক স্প্রে করে নিতে হবে এবং বক্সের ওজন নিয়ে রাখা ভালো, এতে করে বাচ্চার গড় ওজন ও গ্রেড সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। সাধারণত একটি ভালো বাচ্চার গড় ওজন ৩৫-৪০ গ্রাম হয়ে থাকে।
- বাচ্চা ব্রুডারে ছাড়ার সময় বাচ্চার ঠোঁট পানিতে ছোয়াতে হবে, তাতে প্রতিটি বাচ্চাই তার খাওয়ার পানির স্থান চিনতে পারে
- খাবার পাত্রে ১ম দুই-তিন ঘন্টা পর্যন্ত খাবার সরবরাহ না করাই ভালো কেননা বাচ্চা জন্মের সময় পেটে যে ইয়ক থাকে তা দ্রুত শুকাতে সহায়তা করে
- বাচ্চা আসার পর ১-২ দিন পেপারে ছিটিয়ে খাবার সরবরাহ করতে হবে এবং তার পর থেকে নির্ধারিত খাবার পাত্র বা ট্রেতে খাবার সরবরাহ করতে হবে
- সাধারণত ১ম সপ্তাহে প্রতি ১০০ বাচ্চার জন্য একটি খাবার পাত্র এবং ১ টি পানির পাত্র দিতে হবে
- ২য় সপ্তাহ হতে ৩০ দিন বয়স পর্যন্ত প্রতি ৪০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি খাবার পাত্র এবং ৫০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি পানির পাত্র দিতে হবে
- ৩০ দিন পর হতে প্রতি ৩০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি খাবার পাত্র এবং ৪০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি পানির পাত্র দিতে হবে

ব্রুডিং ব্যবস্থাপনায় তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আদ্রতা ঃ

ব্রুডার ঘরের আদর্শ তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আদ্রতা বয়সভেদে পরিবর্তন করতে হয়। সাধারণত শুরুতে ৯৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা দিয়ে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে কমাতে হয়। বয়সভেদে ব্রুডিং তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আদ্রতা ছকে দেয়া হলো
সাধারণত ব্রুডারের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বাচ্চা ব্রুডারের হোভারের নিচ থেকে সরে যায় এবং তাপমাত্রা কমে গেলে বাচ্চাসমূহ হোভারের নীচে এসে জড়ো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে হোভার উঠা-নামা করে ব্রুডারের অভ্যন্তরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

বয়স	তাপমাত্রা (ডিগ্রি ফারেনহাইট)	আপেক্ষিক আদ্রতা%
১ম সপ্তাহ	৯৫	৫৫-৬০
২য় সপ্তাহ	৯০	৫৫-৬০
৩য় সপ্তাহ	৮৫	৫৫-৬০
৪র্থ সপ্তাহ	৮০	৫৫-৬০
৫ম সপ্তাহ	৭৫	৬০-৭০

তাপমাত্রা কম হওয়ায় বাচ্চা দলভূক্ত হয়েছে	তাপমাত্রা বেশি হওয়ায় বাচ্চা ব্রডারের দেয়ালের দিকে সরে গেছে	তাপমাত্রা সঠিক হওয়ায় বাচ্চা সব জায়গায় আছে

আলোক ব্যবস্থাপনা ঃ

১ম সপ্তাহে ব্রুডার হতে ৪-৫ ফুট উচুতে এবং ২য় সপ্তাহ হতে ৭-৮ ফুট উচুতে ১০০ ওয়াটে ৪ টি বাল্ব ঝুলিয়ে দিতে হবে। প্রথম থেকেই প্রতিরাতে আধা ঘন্টা - এক ঘন্টা আলো বন্ধ রেখে বাচ্চাগুলোকে আধারের সাথে পরিচিত করানো উচিত। তা নাহলে রাতে হঠাৎ আলো বন্ধ হয়ে গেলে পাইলিং জনীত সমস্যায় (বাচ্চা ভয়ে জড়ো হয়ে) চাপাচাপিতে বাচ্চা মারা যেতে পারে।

বায়ু চলাচল ব্যবস্থাপনা ঃ

ব্রুডার ঘরে বায়ু চলাচল অত্যন্ত জরুরী। ব্রুডার ঘরের দূষিত বায়ো নিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ বায়ু সরবরাহ থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাপের উৎস হতে নির্গত কার্বন মনো অক্সাইড ও বাচ্চা কর্তৃক নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস জমা হয়ে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া ঘরে সৃষ্ট অ্যামোনিয়া গ্যাস ঘরে দূর্গন্ধ সৃষ্টি করতে পারে। এই জন্য অল্প সময়ের জন্য পর্দা খুলে গ্যাস নির্গমন ও বিশুদ্ধ বায়ুর প্রবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

ডিম হতে সদ্য ফুটন্ত বাচ্চার পেটে ইয়োকটির কিছু অংশ থেকে যায় যা থেকে প্রথম ২-৩ দিন কোন খাদ্য গ্রহণ ছাড়াই বাচ্চা বেচে থাকতে পারে । তবে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বের হওয়ার পর দেরীতে খাদ্য ও পানি সরবরাহ করলে এদের পরবর্তীতে দৈহিক বৃদ্ধি হার কমে যেতে পারে এবং মৃত্যুহার বেড়ে যেতে পারে। একারণে বাচ্চা ফুটে বের হওয়ার পর অতিদ্রুত খামারে স্থানান্তর করতে হবে, প্রথমে পানি এবং পরবর্তীতে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

- ১ম দিন পানিতে গ্লুকোজ মেশতে হবে।
- ১ম ১-২ দিন পানিতে বি-ভিটামিন, ভিটামিন- সি ও স্যালাইন দিতে হবে।
- ব্রুডারে ছাড়ার পর হতে ১-২ দিন ভূট্টাভাঙ্গা (ছোট আকারের) পেপারের উপর ছিটিয়ে সরবরাহ করতে হবে।
- ৩য় দিন হতেই খাদ্য খাবার পাত্রে সরবরাহ করতে হবে।
- প্রতি বাচ্চা ১ম সপ্তাহে গড়ে দৈনিক ৫ গ্রাম, ২য় সপ্তাহে ১০ গ্রাম এবং তারপর হতে প্রতিসপ্তাহে আরো ৫ গ্রাম বেশী হারে খাদ্য খায়। এভাবে ৮ম সপ্তাহে প্রতিটি বাচ্চা দৈনিক গড়ে ৪০ গ্রাম খাবার খায়।
- প্রথম ২ সপ্তাহ পর্যন্ত খাদ্য শেষ হওয়ার সাথে সাথেই খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে দৈনিক ৩-৪ বার খাদ্য দিতে হবে। ৩য় সপ্তাহে দৈনিক ৩ বার এবং তার পর থেকে দৈনিক ২ বার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

পানি ব্যবস্থাপনা ঃ

- খামারে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ থাকতে হবে।
- প্রতিদিন কমপক্ষে ৩ বার পরিমাণমত পানি সরবরাহ করতে হবে।
- পানি বিশুদ্ধ হতে হবে। প্রয়োজনে পানিতে ৩ পিপিএম মাত্রার ক্লোরিন প্রয়োগ করতে হবে।
- খামারে পয়ঃনিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

বাড়ন্ত মুরগির ব্যবস্থাপনা

বাড়ন্তকালীন সময়ে পুলেট এর ব্যবস্থাপনা ঃ

সাধারণত ৮-১৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত সময়কালকে মুরগির পুলেট স্টেজ হিসাবে ধরা হয়। তবে ৮ সপ্তাহ হতে শুরু করে ডিম উৎপাদন পর্যন্ত সময়ই মুরগির পুলেট স্টেজ। এসময়ে মোরগ-মুরগীর সঠিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এসময়ের ব্যবস্থাপনার উপরই নির্ভর করে খামারের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা। বাচ্চার শারীরিক গঠন ১২ সপ্তাহ বয়সের মধ্যে হয়ে থাকে। সুতরাং এই সময়ের পরিচর্যার উপর নির্ভর করে ডিম পাড়ার হার। উল্লেখ্য, এ সময়ে প্রয়োজন অনুসারে ঠোঁট কাটার ব্যবস্থা করতে হবে।

আলোক ব্যবস্থাপনা ঃ

- বাড়ন্তকালে কৃত্রিম আলো প্রদানের প্রয়োজনীয়তা নেই, সাধারণত ১৩ সপ্তাহ বয়স থেকে কৃত্রিম আলো প্রদান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিতে হয়
- প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম আলোর প্রয়োজনীয়তা মুরগির বাড়ন্ত অবস্থার সাথে এবং দিনের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে
- বাড়ন্তকালে দিনের আলো ব্যতীত অপরিকল্পিতভাবে রাতে ঘরে আলো প্রদান করলে আগাম যৌন পরিপক্কতা আসবে এবং ডিম পাড়া শুরু হবে, যা পরবর্তীতে ডিম পাড়ার হারের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে
- বাচ্চা উঠার পর থেকেই প্রতি সপ্তাহে আধা ঘন্টা করে কৃত্রিম আলো কমাতে হয় যা ১৩ তম সপ্তাহে কৃত্রিম আলো একেবারে বন্ধ করতে হবে

খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

একটি ফ্লকে কি পরিমাণ খাবার দিতে হবে বা খাবে তা অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে-

- মুরগির খাদ্য গ্রহণের হার খাদ্যে বিদ্যমান পুষ্টিগুনের উপর নির্ভরশীল।
- ঘরের তাপমাত্রা, আদ্রতা, আলোকের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ও খাদ্য গ্রহণের হার পরিবর্তন করতে পারে
- খাদ্যে নির্ধারিত পরিমাণে আমিষ, ক্যালরি থাকতে হবে।
- খাদ্যে সঠিকমাত্রায় অ্যামাইনো এসিড, কার্বোহাইড্রেট, পানি, ফ্যাট, খনিজ লবন ও ভিটামিন থাকতে হবে
- খামারের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও খাদ্য গ্রহণের উপর প্রভাব ফেলে।
- কাঁচামাল এর গুণগতমান ও প্রক্রিয়াকরণ সঠিক না হলে খাদ্যের গুণগতমাণ কমে যায়।
- কোনভাবেই মেয়াদউত্তীর্ণ খাবার খামারে সরবরাহ করা যাবে না।
- ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত দৈনিক ৩ বার টাটকা খাবার সরবরাহ করতে হবে
- ৯ সপ্তাহ পর হতে প্রয়োজনীয় খাদ্য দৈহিক ওজনের সাথে সমন্বয়করে সরবরাহ করতে হবে
- ব্যাগের মুখ খোলার পর দ্রুততার সাথে খাদ্য শেষ করতে হবে
- খাদ্যের ব্যাগ বাঁশ বা কাঠের তৈরী পাটাতনের উপর শুষ্ক ও আলো-বাতাসযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে
- খাদ্য ও পানির পাত্র প্রতিদিন ভালোভাবে ধৌত করতে হবে

৯-১৬ সপ্তাহ পর্যন্ত বাড়ন্ত মুরগির পুষ্টি

পুষ্টি উপাদান	ব্রোয়ার
বিপাকিয় শক্তি (কি.ক্যালরি/কেজি)	২৮০০
প্রোটিন%	১৬
চর্বি%	৩.৫
আশ%	৫.১
জলীয় অংশ%	১১
ক্যালসিয়াম	০.৬০
সোডিয়াম	০.৫৬
পটাসিয়াম	০.১১
ক্লোরাইড	০.৭৫
ফসফরাস	০.২৩
লাইসিন	০.৯১
মিথিওনিন	০.৪০
মিথিওনিন+সিসটিন	০.৬০
ট্রিপটোফেন	০.৪৪
ভিটামিন-এ আইইউ	১৩২৭.৪
ভিটামিন-ই আইইউ	২৬.৪৭
ফলিক এসিড গ্রাম	০.৯০

৯-১৬ সপ্তাহ বয়সী বাড়ন্ত মুরগির খাদ্য তালিকাঃ

খাদ্য উপাদান	পরিমাণ (কেজি)
ভূট্টা	৫৬
চালের কুড়া	১৩
সয়াবিন মিল	৯.৫০
গমের ভূষি	৯.৫০
তিলের খৈল	৮.৮০
লাইমস্টোন	১.৪০
ডিসিপি	০.৮০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০
লাইসিন	০.১০
মিথিওনিন	০.১০
লবন	০.৫০
মোট	**১০০**

বাড়ন্ত মুরগির প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমান

বয়স (সপ্তাহ)	শারীরিক ওজন (গ্রাম)	খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/মুরগি/দিন)
৯	৮২৫	৪৮
১০	৯৫৯	৫১.১৪
১১	১০৮৩	৫৪.৭২
১২	১১৯৩	৫৭.৫
১৩	১৩০৭	৬০.৮৫
১৪	১৪১৭	৬৪
১৫	১৫০৪	৬৭.৫৬
১৬	১৫৯১	৭০.৮৪

পানি ব্যবস্থাপনা ঃ

- বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ সঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে
- বয়স বাড়ার সাথে সাথে পানির পাত্রের উচ্চতা বাড়াতে হবে
- মুরগির সংখ্যা অনুপাতে পানির পাত্রের সংখ্যা ঠিক রাখতে হবে
- দৈনিক কমপক্ষে ৪ বার পানি সরবরাহ করতে হবে
- পানির পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার করতে হবে

ডিমপাড়া মুরগির ব্যবস্থাপনা ঃ

ডিমপাড়া মুরগি বাছাইয়ে যেসকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো ঃ

- বাছাইকৃত মুরগির ওজন প্রায় সমান হতে হবে
- সতেজ ও সবল হতে হবে
- ঝুটি বড়, লাল, উজ্জ্বল, নরম ও মসৃন হতে হবে
- ঠোঁট মোটা ও বাকাঁ হতে হবে
- চোখ বড় উজ্জ্বল ও সতেজ হতে হবে
- কানের লতি বড়, উত্তাল ও নরম হতে হবে
- চামড়া পাতলা, নরম ও চর্বিহীন হতে হবে
- মলদ্বার বড়, পুরু ও ভেজা হতে হবে

ঘরের তাপমাত্রা ব্যবস্থাপনা ঃ

ডিমপাড়া মুরগির ঘরের আদর্শ তাপমাত্রা ১৫-২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশের তাপমাত্রায়ও সোনালি মুরগি সহনশীল ও উৎপাদনশীলতা ঠিক থাকে। তবে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে ডিম পাড়ার হার কমে যেতে পারে।

ডিমপাড়া মুরগির খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা ঃ

- একটি ফ্লকে কি পরিমাণ খাবার দিতে হবে বা খাবে তা অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভব করে। যথাঃ খাদ্যে বিদ্যমান পুষ্টিগুন, ঘরের তাপমাত্রা, আদ্রতা, আলোকের পরিমাণ ইত্যাদি
- খাদ্যে নির্ধারিত পরিমাণে আমিষ, ক্যালরি, অ্যামাইনোএসিড, পানি, ফ্যাট, খনিজ লবন ও ভিটামিন থাকতে হবে
- খামারের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও খাদ্য গ্রহণের উপর প্রভাব ফেলে
- কাচামাল এর গুণগতমান ও প্রক্রিয়াকরণ সঠিক না হলে খাদ্যের গুণগত মান কমে যায়
- কোনভাবেই মেয়াদউত্তীর্ণ খাবার খামারে সরবরাহ করা যাবে না; কেননা, মেয়াদউত্তীর্ণ খাবারে ফাঙ্গাল গ্রোথ হবে যা খামারে রোগের প্রাদুর্ভাব সৃষ্টি করতে পারে
- খাদ্যের ব্যাগ বাঁশ বা কাঠের তৈরী পাটাতনের উপর শুষ্ক ও আলো-বাতাসযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে
- খাদ্য ও পানির পাত্র প্রতিদিন ভালোভাবে ধৌত করতে হবে
- ডিমপাড়া মুরগি সাধারণত গড়ে দৈনিক ১০০-১১০ গ্রাম খাদ্য গ্রহণ করে
- এসকল বিষয় সঠিকভাবে নিশ্চিত করা না গেলে খামারে মৃত্যুহার বাড়বে, উৎপাদন কমবে

২০-৭২ সপ্তাহ পর্যন্ত সোনালী মুরগির পুষ্টি নির্দেশনাঃ

পুষ্টি উপাদান	লেয়ার
বিপাকিয় শক্তি (কি.ক্যালরি/কেজি)	২৭০০
প্রোটিন%	১৬
চর্বি%	৩.৫
আশ%	৪.১৭
জলীয় অংশ%	১১.৪০
ক্যালসিয়াম	৩.৫২
সোডিয়াম	০.৫১
পটাসিয়াম	০.৯
ক্লোরাইড	০.৬২
ফসফরাস	০.৫৩
লাইসিন	০.৭৭
মিথিওনিন	০.৩৯
মিথিওনিন+সিসটিন	০.৬২
ট্রিপটোফেন	০.৪২
আরজিনিন	১.০
ভিটামিন-এ আইইউ	৮৮.২
ভিটামিন-ই আইইউ	২২.৫
ফলিক এসিড গ্রাম	০.৭৯

১৭-৭২ সপ্তাহ বয়সী মুরগির খাদ্য তালিকাঃ

খাদ্য উপাদান	পরিমান কেজি)
ভূট্টা	৪৬.৫
চালের কুড়া	১৪.৫
সয়াবিন মিল	১৪.৯০
গমের ভূষি	৭.০৫
প্রোটিন কনসেনট্রেট	৭.৬০
ঝিনুকের গুড়া/লাইম স্টোন	৭.০০
ডিসিপি	১.৫
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.২৫
লাইসিন	০.১০
মিথিওনিন	০.১০
লবন	০.৫০
মোট	**১০০**

ডিম পাড়া মুরগির বাসস্থান, ডিমপাড়ার বাসা স্থাপন ও আলোক,

ঘর তৈরী ঃ

- ৫ ফুট লম্বা, ৪ ফুট চওড়া এবং ৩.৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি ঘরে ১০-১৫ টি মুরগি পালন করা যায়
- ১০০০ টি সোনালি মুরগি পালনের জন্য একটি ঘরের আকার ৪০ ফুট * ২০ ফুট অর্থাৎ ৮০০ বর্গফুট হতে হবে যা পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হওয়া বাঞ্চনীয়, ঘরের উচ্চতা ৮-৯ ফুট হলে ভালো ।

মুরগির ঠোঁট কাটা (ডি-বেকিং) ঃ

মুরগির ঠোঁট লম্বা ও সুচালো হলে মুরগি ঠিকভাবে খাদ্য খেতে পারে না, খাদ্য অপচয় হয় এবং ঠোঁকরা-ঠুঁকরির প্রবনতা দেখা যায়। তাই নির্দিষ্ট বয়সে ঠোঁটে ছেকা এবং কাটার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ঠোঁট কাটা বা ছেকা দেয়াকেই ডিবিকিং বলা হয়। ঠোঁট কাটার সময় নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

বয়স	ডিবেকিং পদ্ধতি	মন্তব্য
৮-১০দিন	ছেকা দেয়া	
১২-১৩ সপ্তাহ	ঠোঁট কাটা	ঠোঁট কাটার আগে মুরগিকে অবশ্যই ভিটামিন কে, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি পানি খাওয়াতে হবে

মুরগির ঠোঁট অবশ্যই দক্ষ লোক দিয়ে কাটতে হবে। ঠোঁটের অগ্রভাগের ১/৩ অংশ কাটতে হবে এবং সঠিকভাবে কটারাইজ করতে হবে। ঠোঁট কাটার আগে এবং পরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ও ইলেকট্রোলাইট সরবরাহ করতে হবে। স্ট্রেস কন্ডিশনে ঠোট কাটা যাবে না।

ডিম পাড়ার বাসা ঃ

- মেঝে বা মাচায় মুরগি পালন করলে ঘরে ডিম পাড়ার বাসা দিতে হয় মেঝেতে ডিম পাড়লে মুরগিতে ডিম খাওয়ার বদ অভ্যাস তৈরী এবংমলদ্বারে ঠোকড়ানোর অভ্যাস তৈরী হতে পারে।
- লিটার বা মাচা পদ্ধতিতে মুরগি পালন করলে ডিমপাড়ার বক্স দিতে হয়, প্রতি ৪-৫টি মুরগির জন্য বক্সটির আকার ১*১*১.২ (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) ঘনফুট হতে হবে
- মুরগি ডিম পাড়া শুরু করার ২ সপ্তাহ আগেই বক্স স্থাপন করতে হবে এবং বক্সে আরামপ্রদ দ্রব্যাদি লিটার হিসাবে প্রদান করতে হবে
- প্রতিদিন একই সময়ে একই ব্যাক্তিকে ডিম সংগ্রহ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই অপরিচিত ব্যাক্তি খামারে প্রবেশ করতে পারবে না।

আলোক ব্যবস্থাপনা ঃ

ডিম পাড়া মুরগি তথা সকল বয়সের মুরগির আলোক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আলোক ব্যবস্থাপনার সাথে খামারের মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, মৃত্যুঝুকি, যৌন প্রাপ্তি, দৈহিক গঠন, ডিম উৎপাদন ইত্যাদি সম্পর্কিত। প্রয়োজনীয় আলোক তালিকা সারণিতে দেয়া হলো ঃ

বয়স (সপ্তাহ)	আলোক সময়কাল (ঘন্টা) (প্রাকৃতিক+কৃত্রিম)	আলোর প্রখরতা (লাক্স)
১-২	২৪	২০-৩০
৩	২৩	২০-৩০
৪	২২	২০-৩০
৫	২১	১০-২০
৬	২০	
৭	১৯	
৮	১৮	
৯	১৭	
১০	১৬	
১১	১৫	
১২	১৪	
১৩	১৩	
১৪-১৮	১২	
১৯	১২	২০-৩০
২০	১৩	
২১	১৩,৫	
২২	১৪	
২৩	১৪.৫	
২৪	১৫	
২৫-ডিমপাড়া শেষ পর্যন্ত	১৬	

মুরগির খামারের জীবনিরাপত্তা ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা

মুরগির খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা ঃ

খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। বায়োসিকিউরিটি মেনে চলে সংক্রমন হ্রাস করাই লাভজনক খামার ব্যবস্থাপনার প্রথম শর্ত। সঠিক সময়ে টিকা প্রদান করা গেলে মুরগির রোগ নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে লাভজনক ও টেকসই সোনালী মুরগির বাণিজ্যিক খামার করা সম্ভব। মুরগির টিকা প্রদান কার্যক্রম ছকে প্রদান করা হলো ঃ

মাংস উৎপাদনে সোনালী মুরগি সাধারণত ২-৩ মাস বয়স পর্যন্ত পালন করে বাজারজাত করা হয়ে থাকে। প্রয়োজনীয় টিকা নিম্ন ছকে দেয়া হলো ঃ

ডিম উৎপাদনে সোনালী মুরগির প্রয়োজনীয় টিকা নিম্ন ছকে দেয়া হলো ঃ

দিন	টিকা
১ দিন	মারেক্স
৫-৭ দিন	বি. সি. আর. ডি. বি.
১০-১২ দিন	গামবোরো
১৭-১৯ দিন	গামবোরো
২১-২৩ দিন	বি. সি. আর. ডি. বি.
২৮ দিন	ফাউলপক্স
৬০ দিন	আরডিভি/ রাণীক্ষেত
৭০ দিন	ফাউলপক্স
১০৫ দিন	রাণীক্ষেত
১১০ দিন	ইনফেকসাস ব্রংকাইটিস
তাছাড়া ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে করাইজা, ইডিএস, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের টিকা প্রদান করা যেতে পারে।	

খামারে অন্যান্য বিবেচ্য বিষয় ঃ

- খামারে সপ্তাহে ১ দিন ২ বেলা বি-ভিটামিন, দুই বেলা ভিটামিন এডি৩ই প্রদান করতে হবে।
- প্রতি ৩৫-৪০ দিন পরপর কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে।

মুরগির গুরুত্বপূর্ণ রোগ, লক্ষণ ও করনীয়

সোনালী মুরগি তুলনামূলকভাবে রোগ সহনশীল হলেও কিছু কিছু রোগ খামরের ক্ষতি সাধন করতে পারে। রোগ সমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমন জাতীয় রোগ, ভাইরাস জনিত রোগ, পরজীবি জনিত রোগ (প্রটোজোয়া জনিত রোগ, কৃমি জনিত রোগ, উকুন-আঠালির আক্রমণ), অপুষ্টি জনিত রোগ, বংশগত রোগ ইত্যাদি।

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ঃ

ইহা ভাইরাসজনিত মারাত্বক রোগ। আমাদের দেশে হাই প্যাথজেনিক ও লো-প্যাথজেনিক ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ ঃ

- সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই মুরগি মারা যেতে পারে
- মৃত্যু হার ১০০% পর্যন্ত হতে পারে তবে সাধারণত ৬০-৮০% হয়ে থাকে
- মাথা, মুখ, ঝুটি ফুলে যেতে পারে, পায়ের লোমহীন অংশে, ঝুটিতে রক্ত জমাট হয়ে কালো হয়ে যেতে পারে

চিকিৎসা ঃ

যেহেতু এ রোগে লক্ষণ প্রকাশের আগেই হঠাৎ মারা যায়, সেহেতু এ রোগের চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম। তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। এরোগ নির্ণিত হলে খামারের সকল মুরগি বিনষ্ট করে সঠিকভাবে ডিসইনফেকশন ও ডিকন্টমিনেশন করতে হয়। কেননা, এ রোগ মুরগি হতে মানুষে বিস্তার হতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ ঃ

- টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ
- টিকা প্রদানের সাথে সাথে খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী

ব্রুডার নিউমোনিয়া ঃ

এ রোগ ফাঙ্গাস সংক্রমন জনিত রোগ। এরোগে আক্রান্ত মুরগির ফুসফুসে ফাঙ্গাল গ্রোথ দেখা যায়, শ্বাসকষ্ট হয় এবং বাচ্চা মৃত্যুহার বেড়ে যায়। সাধারণত লিটার হিসেবে ব্যবহৃত ধানের তুঁষ বা কাঠের গুড়া ফাঙ্গাস সংক্রমিত হলে, খাদ্য সঠিকভাবে সংরক্ষন না করলে এবং ব্রুডিং সঠিক না হলেই এ রোগ বিস্তার হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ

- সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই মারা যেতে পারে
- আক্রান্ত মুরগিতে শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যেতে পারে। দুর্বল হয়ে যায় এবং মারা যায়

চিকিৎসা ঃ

যেহেতু এ রোগে লক্ষণ প্রকাশের পর পানিতে তুতে দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ঃ

- প্রয়োজনীয় পরিমানের অধিক দানাদার খাদ্য সরবরাহ না করা
- শুষ্ক ও আলোযুক্ত স্থানে মুরগির খাবার সংরক্ষণ করতে হবে
- খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী

রানীক্ষেত ঃ

ইহা ভাইরাসজনিত মারাত্বক রোগ। নিউক্যাসল ভাইরাস দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে। আমাদের দেশে এই রোগ এনডেমিক আকারে দেখা যায়। যেকোন বয়সের মুরগিতে এ রোগ হতে পারে। এরোগ ৩রকমের হতে পারে। যথাঃ রেসপিরেটরি ফর্ম, নারভাস ফর্ম এবং ভিসারেল ফর্ম।

রোগের লক্ষণ ঃ

- সাধারণত মুরগি চূনা পায়খানা করে
- মৃত্যু হার অধিক
- মাথা বা ঘাড় বাকা হয়ে যায়, পা অবশ হতে পারে, পাখা ঝুলে যায়
- ঘাড় বাকাঁ হওয়ার কারণে খাবার খেতে পারে না

চিকিৎসা ঃ

এ রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম। তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। এরোগ নির্ণিত হলে খামারের সকল মুরগিকে লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে। পটাশিয়াম - পার - ম্যাঙ্গানেট মিশ্রিত পানি সরবরাহ করা হলে রোগের প্রকোপ কিছুটা কমে। তাছাড়া এ সময়ে রানীক্ষেত টিকা প্রয়োগ করা হলে অনাক্রান্ত মুরগিকে রক্ষা করা যায়।

প্রতিরোধ ঃ

- টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ
- টিকা প্রদানের সাথে সাথে খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী

ইনফেকশাস ল্যারিঙ্গো-ট্রাকিয়াইটিস ঃ

ইহা ভাইরাসজনিত মারাত্বক রোগ। ল্যারিঙ্গো-ট্রাকিয়াইটিস ভাইরাস দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে। যেকোন বয়সের মুরগিতে এ রোগ হতে পারে।

রোগের লক্ষণ ঃ

- মৃত্যু হার অধিক
- মুরগি কাসি দিতে পারে, শ্বাস কষ্ট হতে পারে, পাখা ঝুলে যায়
- খাবার গ্রহণের হার কমে যেতে পারে

চিকিৎসা ঃ

এ রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম। তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। এরোগ নির্ণিত হলে খামারের সকল মুরগিকে লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রতিরোধ ঃ

- টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ
- টিকা প্রদানের সাথে সাথে খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী

ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস ঃ

ইহা ভাইরাসজনিত মারাত্বক রোগ। ব্রংকাইটিস ভাইরাস দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে। যেকোন বয়সের মুরগিতে এ রোগ হতে পারে।

রোগের লক্ষণ ঃ

- মৃত্যু হার অধিক
- মুরগি কাসি দিতে পারে,শ্বাস কষ্ট হতে পাওে, পাখা ঝুলে যায়
- খাবার গ্রহণের হার কমে যেতে পারে

চিকিৎসা ঃ

এ রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম। তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। এরোগ নির্ণিত হলে খামারের সকল মুরগিকে লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রতিরোধ ঃ

- টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ

- টিকা প্রদানের সাথে সাথে খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী

গামবোরো রোগ ঃ

ইহা ভাইরাসজনিত মারাত্মক রোগ। ইনফেকশাস বারসাল ডিজিজ/গামবোরো ভাইরাস দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে। সাধারণত ১৫-২৫দিন বয়সের মুরগিতে এ রোগের প্রকোপ অত্যান্ত বেশী। এরোগে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে সহজেই অন্য রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

রোগের লক্ষণ ঃ

- মুরগি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে,শ্বাস কষ্ট হতে পারে, পাখা ঝুলে যায়
- খাবার গ্রহণের হার কমে যেতে পারে
- রানের ও বুকের মাংসে রক্তের দাগ দেখা দিতে পারে

চিকিৎসা ঃ

এ রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম। তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। এরোগ নির্ণিত হলে খামারের সকল মুরগিকে লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে। ইম্যিউস্টিমুল্যান্ট ঔষধ প্রদান করতে হয়। ভিটামিন কে দিতে হয়। তাছাড়া সেকেন্ডারী রোগের সংক্রমণ হতে বিরত রাখার জন্য ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করতে হয়।

প্রতিরোধ ঃ

- টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ
- টিকা প্রদানের সাথে সাথে খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী

কলিব্যাসিলোসিস ঃ

ইহা ব্যাকটেরিয়া জনিত মারাত্মক রোগ। ই-কলাই ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে। যেকোন বয়সেই এ রোগ হতে পারে তবে বাচ্চা বয়সে এরোগের প্রকোপ বেশী।

রোগের লক্ষণ ঃ

- মুরগি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে,শ্বাস কষ্ট হতে পারে, পাখা ঝুলে যায়
- খাবার গ্রহণের হার কমে যেতে পারে
- নরম বা মিউকাস মিশ্রিত পাতলা পায়খানা হতে পারে

চিকিৎসা ঃ

এ রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ রয়েছে। লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের পর এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করতে হয়। ইম্যিউস্টিমুল্যান্ট ও স্যালাইন ঔষধ প্রদান করতে হয়।

প্রতিরোধ ঃ

- খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী
- খাবার পাত্র, পানির পাত্র ডিটারজেন্ট দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে

সালমোনেলোসিস ঃ

ইহা ব্যাকটেরিয়া জনিত মারাত্মক রোগ। সালমোনেলা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে। যেকোন বয়সেই এ রোগ হতে পারে। তবে বাচ্চা বয়সে পুলুরাম ডিজিজ (সালমোনেলা পুলুরাম) এবং ডিম প্রদানের সময়ে সালমোনেলোসিস (সালমোনেলা গেলিনেরাম) নামে পরিচিত।

রোগের লক্ষণ ঃ

- মুরগি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, শ্বাস কষ্ট হতে পারে, পাখা ঝুলে যায়
- খাবার গ্রহণের হার কমে যেতে পারে
- নরম বা মিউকাস মিশ্রিত হলদে পায়খানা হতে পারে
- যকৃত ব্রোঞ্জ রং ধারণ করতে পারে
- ডিম উৎপাদন হার কমে যায়
- বাচ্চাতে মৃত্যুর হার অধিক

চিকিৎসা ঃ

এ রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ রয়েছে। লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের পর এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করতে হয়। ইম্যিউস্টিমুল্যান্ট ও স্যালাইন ঔষধ প্রদান করতে হয়।

প্রতিরোধ ঃ

- খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী
- খাবার পাত্র, পানির পাত্র ডিটারজেন্ট দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে

- খামারে ইঁদুর, পাখি ও চিকার প্রবেশ নিয়ন্ত্রন করতে হবে
- মুরগিকে সালমোনেলা রোগের টিকা প্রদান করতে হবে।

রক্ত আমাশয়/কক্সিডিওসিস ঃ

ইহা প্রটোজোয়া সংক্রমণ জনিত মারাত্মক রোগ। কক্সিডিয়া নামক প্রটোজোয়া সংক্রমণের দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে। যেকোন বয়সেই এ রোগ হতে পারে। তবে বাচ্চা বয়সে রোগের প্রকোপ বেশী।

রোগের লক্ষণ ঃ

- মুরগি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, পাখা ঝুলে যায়, শরীর শুকিয়ে যায়
- খাবার গ্রহণের হার কমে যেতে পারে
- রক্ত মিশ্রিত পায়খানা দেখা যায়
- বাচ্চাতে মৃত্যুর হার অধিক

চিকিৎসা ঃ

এ রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ রয়েছে। লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের পর এন্টিপ্রটোজোয়াল ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করতে হয়। ইম্যিউস্টিমুল্যান্ট ঔষধ প্রদান করতে হয়।

প্রতিরোধ ঃ

- খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী
- খাবার পাত্র, পানির পাত্র ডিটারজেন্ট দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে
- কক্সিডিওসিস এর টিকা প্রাপ্যতা স্বাপেক্ষে টিকা প্রদান করা যেতে পারে
- লিটার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী, কেননা এ রোগের বিস্তার সংক্রমিত লিটার হতেই শুরু হয়ে থাকে

পীড়ন/ধকল জনিত রোগ ঃ

পীড়ন/ধকলের উৎস ঃ

- বাসস্থানের অর্থাৎ ঘরের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা অধিক হলে বা কম হলে
- সংখ্যা অনুপাতে বরাদ্ধকৃত জায়গা অপর্যপ্ত হলে
- ঘরে সরবরাহকৃত খাদ্যের পাত্র ও পানির পাত্রের সংখ্যা কম হলে
- পরিবেশের তাপমাত্রা অধিক হলে
- খাদ্যে টক্সিন এর উপস্থিতির কারণে
- ভেক্সিনেশন ও ডিবেকিং প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা হলে
- খামারে পর্যাপ্ত ভ্যানটিলেশন না থাকলে
- ক্লিনিক্যাল ও সাব-ক্লিনিক্যাল রোগের উপস্থিতির কারণে

পীড়নের কারণে সহজেই বিভিন্ন রোগ খামারে অনুপ্রবেশ করতে পারে। এসকল রোগের মধ্যে ক্যানাবলিজম, ভেন্ট পিকিংসহ অন্যান্য রোগ দেখা দিতে পারে।

ক্যানাবলিজম/ভেন্ট পিকিং ঃ

ইহা মূলত মুরগির বদঅভ্যাসজনিত একটি অবস্থা। এক্ষেত্রে মোরগ-মোরগী একে অপরকে ঠোকরাতে থাকে। কোন মুরগির দেহ হতে কোথাও রক্তপাত হলে ঠোকরানোর পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। পরবর্তীতে ইহা বদঅভ্যাসে পরিনত হয় এবং খামারের সকল মুরগিতে স্থানান্তরিত হয়।

কারণ ঃ

- মুরগির সংখ্যানুপাতে ঘরে স্থান সংকুলান না হলে
- ঘরের অভ্যন্তরে তাপমাত্রা ও আদ্রতা অধিক হলে
- খাদ্যে টক্সিন এর উপস্থিতির কারণে
- খাদ্যে পর্যাপ্ত ভিটামিন, ফাইব্রাস কার্বোহাইড্রেট ও খনিজ এর অভাবে
- সংখ্যা অনুপাতে খাদ্য ও পানির পাত্র না থাকলে
- ঘরে প্রয়োজন অতিরিক্ত আলোক প্রদান করার কারণে
- টিকা প্রদান ও ডিবিকিং এ দীর্ঘসূত্রতা

প্রতিকার ঃ

- ঘরের স্থান অনুযায়ী মুরগির সংখ্যা নির্দিষ্ট করতে হবে
- ঘরের অভ্যন্তরের তাপমাত্রা ও আদ্রতা ব্যবস্থাপনা ভাল করতে হবে
- খাদ্যে পর্যাপ্ত ভিটামিন, ফাইব্রাস কার্বোহাইড্রেট ও খনিজ এর সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে

- সংখ্যা অনুপাতে খাদ্য ও পানির পাত্র দিতে হবে
- ঘরে আলোক ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে হবে
- টিকা প্রদান ও ডিবিকিং সঠিক সময়ে দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে

প্রশিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য রোগের কারণ, লক্ষণ, প্রতিরোধ, চিকিৎসা সম্পর্কে তথ্যাদি প্রস্তুত করে নিয়ে আসবেন এবং সাবলিল ভাষায় অংশগ্রহনমূলক আলোচনা করবেন। প্রতিটি রোগের চুম্বক অংশ পুণঃ আলোচনা ও অংশগ্রহণকারীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করবেন।

চিত্রে বিভিন্ন রোগের লক্ষণ

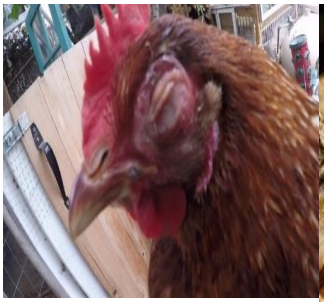

করাইজা রোগের লক্ষণ

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের

ক্যানাবলিজম রোগের লক্ষণ

কক্সিডিওসিস রোগের লক্ষণ

ফাউল পক্স রোগের লক্ষণ

মাইকোপ্লাজমোসিস রোগের লক্ষণ

সোনালী মুরগি পালনে আয়-ব্যয়ের হিসাব ঃ

বাণিজ্যিকভাবে ১০০০ সোনালী মুরগি পালনে আয়-ব্যয়ের হিসাবঃ

১০০০ টি সোনালী মুরগি পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ঘরের আকারঃ **দৈর্ঘ্য ঃ** ৪০ ফুট, প্রস্থঃ ২০ ফুট, **উচ্চতা ঃ** ৮-৯ ফুট (১০/১২ ফুট) অর্থাৎ আয়তকার ঘরের আকার ৮০০ বর্গফুট । এক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কম বা বেশী হতে পারে।

খরচের হিসাব ঃ

ঘর পাকা, সেমিপাকা, কাঁচা বা শুধুমাত্র ফ্লোর পাকা হলেও চলে।

খরচের খাত	পরিমাণ
স্থায়ী খরচ	
ঘর তৈরী (পিলার, পাকা ফ্লোর, টিন, বাঁশ, কাঠ, মিস্ত্রি খরচ, সিলিং ইত্যাদি)	৮০০০০/-
খাবার পাত্র, পানির পাত্র, ইলেকট্রিক সরঞ্জামাদি, ব্রুডার ইত্যাদিসহ আনুসাঙ্গিক ব্যয়	৩০০০০/-
মোট	১১০০০০/-
আবর্তক ব্যয়	
১০০০ টি বাচ্চা ক্রয় বাবদ @ ৩০ টাকা/বাচ্চা	৩০০০০/-
খাদ্য খরচ ৪০ ব্যাগ @ ২০০০/- ব্যাগ	৮০০০০/-
বিদ্যুৎ খরচ	৪০০০/-
ঔষধ ও ভ্যাকসিন খরচ	১০০০০/-
আনুসঙ্গিক খরচ	৫০০০/-
শ্রমিক মজুরি	১০০০০/-
মোট	১৩৯০০০/-
সর্বমোট ব্যয়	
স্থায়ী খরচের ১/১০ হিসেবে প্রতি ব্যাচ (একবারের স্থায়ী খরচে ১০ টি ব্যাচ পালন করা যাবে)	১০১০০/-
আবর্তক খরচ	১৩৯০০০/
প্রতি ব্যাচে মোট খরচ	১৪৯১০০/-
আয়	
৯৫০ টি বাড়ন্ত মুরগি (৫% মুত্য হার এবং প্রতিটির গড় ওজন ৭০০ গ্রাম হিসাবে এবং প্রতি কেজি মুরগির দাম ৩০০/- হারে) বিক্রয় বাবদ	১৯৯৫০০/-
বিষ্টা বিক্রয় বাবদ আয়	১৫০০/-
মোট আয়	২০১০০০/-
নীট মুনাফা	৫১৫০০/-
সঠিক বাজার পাওয়া গেলে এবং নিজস্বভাবে পালন করা গেলে নীট মুনাফা অধিক পাওয়া যায়।	

গবাদিপশু ও পোল্ট্রি খামার বর্জ্য ব্যবহার করে কম্পোস্ট বা জৈব সার তৈরি

প্রযুক্তিটির বৈশিষ্ট্যঃ

- জৈব সার তৈরির মাধ্যমে খামারে উৎপাদিত বর্জ্যের ব্যবহার ও পরিবেশ দূষণ রোধ
- যাবতীয় রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ও আগাছার বীজ ধ্বংস করা
- জৈব্য সার তৈরীর ফলে বর্জের গন্ধ দূর করা
- সহজে প্যাকিং ও পরিবহণ করা যায়
- কৃষিক ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়
- জৈব সার বিক্রি করে খামারের আয় বৃদ্ধি করা যায়
- তেমন কোন বারতি খরচের প্রয়োজন হয় না
- মাছের পুকুরে ব্যবহার করা যায়

সেড বা ছাউনিঃ বৃষ্টির পানি না ঢুকে এমন ছায়াযুক্ত স্থান। শন, ঝড়, বাঁশ, চাটাই ও উপরে পলিথিন দিয়ে অল্প খরচে সেড তৈরী করা যায়। গর্তের আকৃতিঃ ফুট লম্বা, ৩ ফুট প্রস্থ ও ৩ ফুট গভীরতা যা সেডের নীচে হবে, প্রাপ্ত বর্জ্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করবে গর্তের আকৃতি।

কম্পোস্ট বা জৈব সার তৈরিতে ব্যবহৃত বর্জ্যঃ

গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া এবং মুরগির খামারে উৎপাদিত গোবর, বিষ্ঠা হল প্রধান কাঁচামাল। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের লতা পাতা, আগাছা যেমন- কচুরি পানা, হেলঞ্জা/সেচী ঘাস ইত্যাদি। বর্জ্যে আর্দ্রতা বেশী হলে শুকনা শুকনা ভাব রাখার জন্য উহার সাথে কাঠের গুড়া/কাটা শুষ্ক খড় মিশিয়ে দিতে হবে। বর্জ্যের শুষ্ক বস্তু ৪৫% থাকলে তা সরাসরি ব্যবহার করা যাবে। অর্থাৎ বর্জ্যে পানির ভাগ ৫৫% এর বেশী হলে আনুপাতিক হারে শুষ্ক বস্তু যোগ করতে হবে। সাধারণত বর্জ্যে আর্দ্রতার পরিমাণ ঠিক আছে কিনা তা বুঝার সহজ উপায় হচ্ছে কিছু পরিমাণ উপাদান হাতের মুঠোয় নিয়ে মুষ্ঠিবদ্ধ করলে যদি জমাট বাঁধে তবে বুঝতে হবে আর্দ্রতা ঠিক আছে। আর চাপ দেওয়ার পর যদি পানি বের হয় তবে বুঝতে হবে আর্দ্রতা বেশী আছে।

বায়ো-স্লারি

গরুর গোবর/মুরগীর বিষ্ঠা ডাইজেস্টারের ভিতরে পরিপাক বা কোমলায়িত হওয়ার পর আউটলেট দিয়ে অর্ধতরল অবস্থায় বের হয়ে আসলে তাকে বায়ো-স্লারি বলে। বায়ো-স্লারি একটি অতি উন্নত মানের জৈব সার। ইহা তরল, শুকনো কিংবা কম্পোস্ট আকারে ব্যবহার করা যায়।

স্লারি ব্যবহারের উপকারিতাঃ

১। উন্নত মানের জৈব সার হিসাবে কৃষি জমিতে ব্যবহার করে মাটির জৈব পর্দাথ বজায় রাখার মাধ্যমে উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায়
২। বায়ো-স্লারিতে উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানের গুনগতমান (প্রাপ্যতা) সনাতন জৈব সার যেমন গোবর, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, খামারজাত সার ও কমপোস্ট অপেক্ষা বেশী থাকে বলে এতে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় ও উদ্ভিদ সহজে গ্রহন করতে পারে
৩। রাসায়নিক সারের সাথে বায়ো-স্লারি ব্যবহার করা হলে রাসায়নিক সারের সাশ্রয় এবং জমিতে দরকারী জৈব পদার্থ যোগ হয়।
৪। অম্লীয় মাটিতে বায়ো-স্লারি ব্যবহারের ফলে মাটির পুষ্টি উপাদান সহজলভ্য হয়
৫। ফসলের ফলন ও গুনগতমান বৃদ্ধিতে এ সার ব্যবহার লাভজনক
৬। বীজতলা বা চারা উৎপাদনের জন্য টবে বা পলি ব্যাগে মাটির পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়
৭। বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষায় ব্যবহার করা যায়
৮। টবে ফুলের গাছ ও বাড়ীর ছাদে বাগান করার ক্ষেত্রে বায়ো-স্লারি ব্যবহার অধিক সুবিধাজনক
৯। পুকুরে কিংবা মৎস্য খামারে ব্যবহার করলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়
১০। ভার্মি-কম্পোস্ট তৈরিতে ব্যবহার করা যায়
১১। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাশরুম চাষে ব্যবহার করা যায়।

স্লারি সংগ্রহ পদ্ধতি, বায়ো কোম্পোস্ট তৈরি এবং ব্যবহার

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে নির্গত বায়ো-স্লারি প্ল্যান্টের আউটলেট থেখে নালা অথবা পিভিসি পাইপের মাধ্যমে পিটের সংগ্রহ করতে হয়। যদি পিট নির্মাণ করা সম্ভব না হয় তা হলে প্লাষ্টিকের ড্রামেও স্লারি সংগ্রহ করা যায়। বায়ো-স্লারি পিট বায়োগ্যাস প্লান্টের একটি অভিন্ন অংশ। একে বাদ দিয়ে প্ল্যান্টটিকে পরিপূর্ণ বলা যায় না। ওভার ফ্লোর পাইপের নিকটে দুটি পিট থাকবে (চিত্রানুযায়ী) যেন বায়ো-স্লারি অতি সহজে পিটে জমা হতে পারে। পিটগুলি হাইড্রোলিক চেম্বার হতে কমপক্ষে ১০০ সে.মি দুরত্বে রাখা দরকার যেন মাটি সরে গিয়ে হাইড্রোলিসক চেম্বারের কোন ক্ষতি করতে না পারে। দুটি পিটের আয়তন ডাইজেস্টারের আয়তনের সমান হতে হবে। বাস্তবতার আলোকে আয়তন ঠিক রেখে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিবর্তন করা যাবে। পিটের গভীরতা ১ মি: এর বেশী হওয়া উচিত নয়। কারণ এতে স্লারি সংগ্রহ কঠিন হতে পারে। পিটের চারপাশের উঁচু করে বাঁধ দিতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি ঢুকতে না পারে।

কম্পোস্ট তৈরিঃ

বাড়ীতে প্রাপ্য বিভিন্ন জৈব পদার্থ যেমন গাছের পাতা, খড়, রান্না ঘরের আবর্জনা ইত্যাদি স্লারির সঙ্গে মিশিয়ে কম্পোস্ট তৈরি করা হয়। নিম্ন পদ্ধতিতে পিটে কম্পোস্ট তৈরি করা যায়ঃ

১। পিটের তলায় শুকনো বিভিন্ন জৈব পদার্থ যেমন খড়, কচুরীপানা, গাছের শুকনো পাতা, বাড়ির আর্বজনা ইত্যাদি ১৫-২০ সে.মি পুরো করে বিছিয়ে দিতে হবে। এই সকল শুকানো জৈব পদার্থ বায়ো-স্লারি জলীয় অংশ শুষে নেয় এবং বায়ো-স্লারিতে বিদ্যমান যে সকল উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান চুয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করে।

২। পিটের তলায় বিছিয়ে দেওয়া শুকনো জৈব পদার্থের উপর বায়ো-স্লারি জমা হবে। যদি সম্ভব হয় স্লারি সমানভাবে জৈব পদার্থের উপর ছড়িয়ে দিলে ভাল হয়।

৩। বায়ো-স্লারি সমান ভাবে ছড়িয়ে দেবার পর এর (স্লারির) উপর ৪ সে.মি ছোট করে কাটা খড় বা অন্য কোন শুকানো জৈব পদার্থ বিছিয়ে দিতে হবে। খড় বা জৈব পদার্থের আবরণ বায়ো-স্লারিকে রোদে শুকানো থেকে রক্ষা করে গাছের খাদ্য উপাদান নষ্ট হওয়া রোধ করে।

৪। এভাবে পর্যায়ক্রমে বায়ো-স্লারি বা শুকনো খড় বা জৈব পদার্থ স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পিট সম্পূর্ণভাবে ভর্তি করতে হবে। ভতিকৃত স্লারি ও খড় বা জৈব পদার্থের উচ্চতা পিটের মাটির লেভেল থেকে ১৫-২০ সে.মি উঁচু হওয়া দরকার।

৫। পিট সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে গেলে একটি পলিথিন পাতলা স্তরের মাটি দিয়ে ঢেকে এক মাসের জন্য রেখে দিতে হবে।

৬। একইভাবে দ্বিতীয় পিটটি পূর্ণ করা শুরু করতে হবে।

৭। সম্ভব হলে এক মাস পর প্রথম কম্পোস্টকে উল্টিয়ে দিতে হবে। পিটের কম্পোস্টকে আগের মত পলিথিন বা হালকা ভাবে মাটির কম্পোস্টকে আগের মতো পলিথিন বা হালকা ভাবে মাটির স্তর দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

৮। একইভাবে পুনরায় ১৫ দিন পর প্রথম পিটের কম্পোস্টকে উল্টিয়ে ও ঢেকে দিতে হবে।

৯। দ্বিতীয় পিটের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

১০। পিটের উপর চাল তৈরীতে করলে তা বৃষ্টির পানি প্রবেশ রোধ করবে এবং অতিরিক্ত সূর্যের আলো থেকে রক্ষা করবে।

১১। লতাজাতীয় সব্জি আবাদে এই চাল জাংলা/মাচা হিসাবে ব্যবহারে মাধ্যমে চাল তৈরীর অতিরিক্ত খরচ পুষ্টিয়ে নেয়া যায়।

স্লারি বা স্লারি কম্পোস্ট উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ

স্লারি বা স্লারি কম্পোস্ট গাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। স্লারি বা স্লারি কম্পোস্ট বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় বিধায় এর পুষ্টিমান প্রচলিত জৈব সার যেমন গোবর, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, খামারজাত সার ও কম্পোস্ট অপেক্ষা শতকরা ২০-৩০ ভাগ বেশী থাকে।

জৈব সার ব্যবহার করলে পরবর্তী ফসল অজৈব সার কম ব্যবহারের পরিমাণঃ

জৈব সার	পরবর্তী ফসলে অজৈব সারে পরিমাণ কমানো (কেজি) (ব্যবহারকৃত প্রতি টন জৈব সারে হিসাবে)		
	ইউরিয়া	ফসফেট সার	পটাশ সার
গোবর সার/স্লারি কম্পোস্ট	১০	৮	১০
মুরগীর বিষ্ঠা স্লারি	২৫	৫২	১৪
খামারজাত সার	৭	৪	৬
কম্পোষ্ট	৬	৫	৬

কম্পোস্ট তৈরি করার পাশাপাশি বায়ো-স্লারি অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করা যায়। যেমনঃ

-সরাসরি কৃষি জমিতে সার হিসেবে প্রয়োগ

-সরাসরি মাছের খামারে (পুকুরে) মাছের খাদ্য হিসেবে প্রয়োগ

-যদি কম্পোস্ট পিটে কম্পোস্টিং করা সম্ভব না হয় তবে হিপ (স্তুপাকৃতি) কম্পোস্টিং করা যেতে পারে

-ভার্মি-কম্পেস্টিং এর মাধ্যমে জৈবসার প্রস্তুত

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগ এর কবল থেকে পশুপাখি রক্ষায় করণীয়

বাংলাদেশ ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের মানুষ, পশুপাখি, উদ্ভিদ প্রতিনিয়তই প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে থাকে, খরা, শীত, সিডর, আইলা, তাপমাত্রার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়া, অতি বৃষ্টি, বন্যা, জলোচ্ছাস, খাদ্যের অভাব, মারাত্মক সংক্রামক রোগ ইত্যাদি নানাবিধ দুর্যোগ উল্লেখযোগ্য। স্বাভাবিক দায়িত্ব নির্বাহ ছাড়াও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভাগ, জেলা ও উপজেলা এবং প্রকল্পসমূহের মাঠ পর্যায়ের
কর্মকর্তা-কর্মাচরীগন নিম্নলিখিত কর্মসমূহ সম্পাদন করেন ।

স্বাভাবিক সময়েঃ

ক) প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড়/বন্যা মৌসুম শুরু ওয়ার পূর্বেই ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকার প্রাণিসম্পদ নিরাপত্তা ও সুরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসারগণ কৃষক এবং খামারীদের সজাগ করবেন।

খ) অধীন অফিসসমূহ, খামারী এবং এর প্রতিনিধি প্রভৃতির সহিত অধিদপ্তরের গৃহীত নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করবেন।

গ) দুর্যোগ চলাকালীন সময়ে প্রাণিসম্পদ সমূহ, অধিদপ্তরের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার সাথে রাখার জন্য স্থায়ীভাবে নিরাপদ স্থান চিহ্নিত করবেন।

ঘ) দুর্যোগপ্রবণ এলকাসমূহের সরকারী ও বেসরকারী প্রাণিসম্পদ সমূহের নবায়নকৃত তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করবেন।

ঙ) দুর্যোগপ্রবণ এলকাসমূহের জনসংখ্যা, খামারী ও খামারসমূহের জরিপ ও উপাত্ত সংরক্ষণ করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর তাহা হালনাগাদ করবেন।

চ) সামুদ্রিক জলোচ্চাসজনিত আঘাতের কারণে লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করবার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার বাঁধ ও স্লুইস গেইটসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করবেন।

ছ) ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা প্রস্তুতি ও পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং পুনর্বাসন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রহণ করবেন।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ এবং উদ্ধার অভিযানের জন্য সমুদ্রগামী যান রিকুইজিশন করার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করবেন (ঘূর্ণিঝড় দুর্যোগকালীন সময়)।

খ) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করবেন এবং স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে যোগাযোগ কর্মকর্তা প্রেরণ করবেন।

পুনর্বাসন পর্যায়ে করণীয়ঃ

ক) সরকারী ও ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রাণিসম্পদ খাতে ক্ষতির পরিমাণ নিরূপনের জন্য অবিলম্বে জরিপকার্যের ব্যবস্থা এবং এই খাতের জন্য অবিলম্বে দীর্ঘ মেয়াদী ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন ও তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করবেন।

খ) প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন খাতে অবিলম্বে দীর্ঘ মেয়াদী ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন এবং কাজের অগ্রগতির বিষয়ে উচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন পেশ করবেন।

গ) ক্ষতিগ্রস্থ খামারীদের পুনর্বাসনের জন্য অণুপ্রাণিত এবং সহায়তা করবেন।

ঘ) স্থানীয় প্রশাসনকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সহায়তা প্রদান করবেন।

ঙ) খামারীদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করবেন।

বাংলাদেশে প্রতিবছর কোন না কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ দেখা দেয়। এসকল প্রাকৃতিক দূর্যোগ জানমাল, গবাদি প্রাণি এবং পোল্ট্রির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে থাকে। সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি সম্পর্কে জনসাধারণ অবহিত থাকলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে কমানো সম্ভব হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতিরোধ ব্যবস্থাঃ

১. বন্যা ও ঘূণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করে দূর্যোগগত এলাকার মানুষ, প্রাণিসম্পদের সমস্যা মোকাবেলা করা যায়।
২. উপকূলীয় বনায়ন করে প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা করা যায়।
৩. প্রাণির খাবারের জন্য লবণাক্ত সহিষ্ণু ঘাস চাষ করা যেতে পারে।
৪. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও ঝুঁকি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা যেতে পারে।
৫. রেডিও, টিভি ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে পরিবেশ বিপর্যয়ের আগাম সংবাদ এবং তাৎক্ষণিক সংবাদ প্রচার করে
৬. জনসচেতনতা বাড়ানো যায়।
৭. দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য মূল্যবান সম্পদ এবং প্রাণিসম্পদকে স্থানান্তর করা যেতে পারে।
৮. পশু পাখির জন্য নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা যেতে পারে।

৯. গবাদিপশুর দূর্যোগ কালীন খাবার মজুদ রাখা যেতে পারে।
১০. রেডিও, টিভি এবং মাইকে নিজ নিজ এলাকার মসজিদে দূর্যোগ এর খবর প্রচার করা যেতে পারে।
১১. দূর্যোগ, দূর্যোগের স্থায়ীত্ব, সতর্কসংকেত, দূর্যোগ বার্তা, জরুরী দূর্যোগ মোকাবেলা, দূর্যোগ পূর্ব এবং দূর্যোগ পরবর্তী জরিপ, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্বেচ্ছা সেবক তৈরি এবং তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা, পোস্টার, লিফলেট বিলি করা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও খামারি সংগঠনকে দূর্যোগ মোকাবেলায় আগাম প্রস্তুতি গ্রহণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রাণিসম্পদ প্রতিপালনকারীদের অধিকতর সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে দূর্যোগ মোকাবেলায় জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা যেতে পারে।

দুর্যোগকালীন সময়ে করণীয়ঃ

জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রতিবছরই অনাকাঙ্ক্ষিত প্রাকৃতিক দূর্যোগ বয়ে যায়। এর মধ্যে রয়েছে বন্যা, খরা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়। যা মানুষ এবং গবাদিপশুর জন্য হুমকিস্বরূপ। প্রতিবছরই প্রাকৃতিক দূর্যোগে জীবন এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোর দীর্ঘদিন ড্রেজিং না করায় সবগুলো নদী পলি দ্বারা ভর্তি হয়ে ইদানীং বন্যার প্রকোপ বেড়ে গেছে। নদীর তীরবর্তী শহর ও গ্রামে বহু গবাদি প্রাণি ও দুগ্ধখামার রয়েছে। এ ছাড়া উপকূলীয় চরাঞ্চলে মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য গবাদিপশু ক্ষেত্র বিশেষে প্রধান অবলম্বন।

সমুদ্রতীরবর্তী জেলাগুলোতে সাইক্লোন-ঘূর্ণিঝড় প্রায় প্রতিবছরই আঘাত হানে। এতে করে গবাদিপশু পালনকারী কৃষকগণ মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হন। এমতাবস্থায় সকল কৃষক ও খামারীদের প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় আগাম প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশে সাধারণত এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এ দূর্যোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সুতরাং প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রবণ এলাকায় জনসাধারণ এবং প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোর দায়িত্ব হবে দূর্যোগকালীন সময়ে গবাদিপশুর আশ্রয় ও খাবারের পরিকল্পনা পূর্ব থেকে নির্ধারণ করা। প্রাকৃতিক দূর্যোগ আসার পূর্বেই গবাদি পশুর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুদ করতে হবে। এক্ষেত্রে খড় সংক্ষরণ, কাঁচা ঘাস ড্রাম পদ্ধতিতে সাইলেজ তৈরি করে মজুদ করা যেতে পারে। এ সাইলেজ তৈরি পদ্ধতি খামারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। এছাড়া দানাদার খাদ্যের মজুদ দূর্যোগ প্রবণ এলাকায় পূর্বে থেকেই নিশ্চিত করা জরুরি। দূর্যোগকালীন সময়ে গবাদিপশু নানান ধরণের স্বাস্থ্যঝুঁকির শিকার হয়। বিশেষ করে মাটি ও পানিবাহিত রোগ এদের বেশি সংক্রমিত করে।

দূর্যোগকালীন সময়ের পূর্বেই সকল প্রাণিকে সংক্রামক রোগের (তড়কা, বাদলা, গলাফুলা, ক্ষুরা রোগ) টিকা প্রদান করা জরুরি। সময় পেটের পিড়া- ডায়রিয়া, আমশয়সহ অন্যান্য রোগ দেখা দেয়। এসময় গবাদি প্রাণিকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে। গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে বিভিন্ন গাছের পাতা যেমন: কাঠাল পাতা, কলাপাতা, বাঁশপাতা, হিজল পাতা, বাবলা পাতা এবং অন্যান্য পাতা খাওয়ানো যেতে পারে।

- ✓ বাড়ির আশে পাশে জলজ ডোবা পুকুরে পারা, জার্মান ঘাস বন্যার প্রস্তুতি হিসেবে পূর্বে থেকেই লাগানো যেতে পারে।
- ✓ বাড়ির আশে পাশে, পুকুর পাড়ে, রাস্তার পাশে পশু খাদ্য হিসেবে ইপিল-ইপিল, নেপিয়ার হাইব্রিড পরিকল্পিত ভাবে দূর্যোগ মোকাবেলায় লাগানো যেতে পারে।
- ✓ বন্যা সরে গেলে পশু খাদ্য হিসেবে খেসারী মাসকলাই ভূট্টা চাষ করা যেতে পারে।
- ✓ গবাদিপশুকে ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র এবং ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক তৈরি করে খাওয়ানো যেতে পারে।
- ✓ এছাড়াও আশে পাশে কচুরিপানা, অন্যান্য জলজ ঘাস সংগ্রহপূর্বক পরিস্কার পানি দ্বারা ধৌত করে খড়ের সাথে ১ : ১ অনুপাতে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

বন্যাকবলিত এলাকায় ঘাস চাষঃ

- ✓ বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরপরই (অক্টোবর-নভেম্বর মাসে) কর্দমাক্ত জমি ঘাস চাষের জন্য নির্বাচন করা যায়। আলাদা ভাবে জমিতে চাষ দেওয়া বা জমি তৈরীর দরকার হয় না। উক্ত কর্দমাক্ত জমিতে সরাসরি ঘাসের কাটিং লাগানো যায়।
- ✓ বপণ পদ্ধতি, সার প্রয়োগ এবং কাটিং এর পরিমাণ উপরের বর্ণনা মতই।
- ✓ প্রথম চাষের সময় ঘাসের সাথে ডাল জাতীয় ফসলের আবাদ করা যেতে পারে।
- ✓ লাগানোর ৪৫-৬৫ দিন পর প্রথম কাটিং এবং এরপর প্রতি ৩০ দিন পর পর ঘাস কাটা যায়।
- ✓ এপ্রিল মে মাস পর্যন্ত ঘাস পাওয়া যায়। তবে, অবশ্যই বন্যার পানি আসার পূর্বেই শেষ কাটিং দিতে হবে; কেননা, এ ঘাস বন্যার পানিতে বেঁচে থাকতে পারে না।
- ✓ অতিরিক্ত ঘাস সাইলেজ উপায়ে সংরক্ষণ করা যায়।
- ✓ পরবর্তী সময়ে বপনের জন্য কাটিং উঁচু জায়গায় সংরক্ষণ করা যেতে পারে।